৬

অর্থনৈতিক সংগঠন
Economic Organization

সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয় নৃবিজ্ঞানের যে শাখায় তাকে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। শিল্পভিত্তিক সমাজ নয় যেগুলো, তা নিয়ে প্রথাগত অর্থশাস্ত্রের তেমন আগ্রহ ছিল না। তার মানে অর্থশাস্ত্রের আলোচনা ছিল মূলত ইউরোপ নিয়ে, পরবর্তী কালে উত্তর আমেরিকার সমাজ নিয়ে। এছাড়া অবশ্য উপনিবেশের সময়কালে এবং পরবর্তী কালে গঠিত রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়েও অর্থশাস্ত্রের আগ্রহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের পরিধিতে অন্যান্য সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সংগঠন নিয়ে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অবশ্য একটা মানদন্ড কাজ করেছে। সেই মানদন্ডটাও আবার অর্থশাস্ত্রের বিষয়ের মত। তা হচ্ছে পুঁজিবাদ। যে সকল সমাজে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নেই তাকে নৃবিজ্ঞানীরা প্রাক্-পুঁজিবাদী বলেছেন। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় প্রথম দিকের নৃবিজ্ঞানীরা অন্যান্য আর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদের দিকে যাত্রাকে স্বাভাবিক মনে করেছেন। সেদিক থেকে একে আমরা বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও বলতে পারি। তবে কৃষক সমাজকে স্বতন্ত্র আর্থনীতিক ব্যবস্থা মনে করেছেন কেউ কেউ, অন্য অনেকেই আবার তা করছেন না। বহু নৃবিজ্ঞানীই পুঁজিবাদকে আদর্শ ধরে নেবার বিপক্ষে। বিভিন্ন সমাজে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দেখতে গিয়ে তাঁরা মূলত উৎপাদনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পরে বণ্টন। এর মানে নৃবিজ্ঞানের যুক্তি হচ্ছে: যেহেতু সকল সমাজেই বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদন হয় এবং তা সমাজের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাই সেখানে অর্থনৈতিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করা দরকার। এই সকল বিষয় বর্তমান ইউনিটে আলোচনা করা হবে। এতে ৪টি পাঠ রয়েছে।

◆ পাঠ ১ : অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব
◆ পাঠ ২ : প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা
◆ পাঠ ৩ : বিনিময় এবং বণ্টন
◆ পাঠ ৪ : কৃষক আর্থব্যবস্থা

পাঠ - ১

অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব
Subject-matter and Importance of Economic Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- পৃথিবীর সকল স্থানে এবং সকল কালে আর্থব্যবস্থার ধরন মোটেই এক ও অভিন্ন নয়
- প্রচলিত অর্থশাস্ত্র কেবল আধুনিক কালের বাজার ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে
- নৃবিজ্ঞান প্রচলিত অর্থশাস্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে সমাজের নানান পরিসরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক খোঁজে

নৃবিজ্ঞানের যে শাখায় সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং গবেষণা করা হয়ে থাকে তাকে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

আমরা যখনই আর্থব্যবস্থার কথা ভাবি তখনই কতকগুলো ধারণা আমাদের মাথায় কাজ করে। সেইগুলির বাইরে আর কোন কিছুকে সাধারণত আমরা অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে ভাবি না। আমাদের সাধারণ ভাবনার মূল বিষয়গুলো প্রচলিত অর্থশাস্ত্র (Economics) হতে এসেছে। আপনারা সকলেই জানেন যে লেখাপড়ার জগতে জ্ঞানকান্ড হিসেবে অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতি অনেক পুরোনো। পক্ষান্তরে নৃবিজ্ঞান অনেক নবীন জ্ঞানকান্ড। প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে যেভাবে আলাপ-আলোচনা এবং ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে তা নৃবিজ্ঞানের চর্চায় যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। ফলে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং অধ্যয়নে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ভাবনা-চিন্তা উঠে এসেছে। এখানে সংক্ষেপে বলে রাখা যায়: নৃবিজ্ঞানের যে শাখায় সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং গবেষণা করা হয়ে থাকে তাকে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। তবে গোড়াতেই একটা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। তা হচ্ছে: নৃবিজ্ঞানে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই 'অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান' শাখাটি দাঁড়িয়ে যায়নি। বরং বেশ কিছুকাল গবেষণা কাজের পর 'অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান' নামের এই শাখাটি পরিচিত হয়েছে।

অর্থশাস্ত্র এবং অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান

অনেকেই অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলতে অর্থনীতি বা অর্থশাস্ত্র এবং নৃবিজ্ঞানের সমন্বয় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু আপনারা ইতোমধ্যেই জানেন যে ইউরোপের নৃবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সেইসব সমাজ পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেছেন। নৃবিজ্ঞান নামক জ্ঞানকান্ডটির সূচনা এভাবেই ঘটেছে। সেসব নৃবিজ্ঞানীরা প্রথমেই লক্ষ্য করেছেন প্রচলিত অর্থশাস্ত্র থেকে এইসব সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাদ পড়ে গেছে। নৃবিজ্ঞানীরা যখন আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন সমাজে গবেষণা করতে যান তখন তাঁরাও ভাবতেন যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বলতে যা বোঝায় তা কেবল পশ্চিমের (ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সমাজেই আছে। কিন্তু নিজেদের কাজ করতে গিয়ে তাঁদের উপলব্ধি জন্মায় যে এই সকল অপশ্চিমা সমাজের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ড রয়েছে। আর তা কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এভাবে আর্থব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের অর্থশাস্ত্রের পরিধির বাইরে চিন্তা-ভাবনা জন্মে। নৃবিজ্ঞানের প্রথম কালে, বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত, যখন আমরা 'অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান' নামে কোন শাখার কথা জানি না তখনও নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা কাজে অপশ্চিমা সমাজের বা ইউরোপের বাইরের সমাজের নানানভাবে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। বলা চলে, নৃবিজ্ঞানীরা তাঁদের এথনোগ্রাফিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়েও আলোকপাত করেন। এখানে আমরা বহুল পরিচিত নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্‌ল ম্যালিনোস্কির নামও উল্লেখ করতে পারি। তিনিও তাঁর বিখ্যাত বই (এথনোগ্রাফি) *আরগোনাট্‌স অব দ্য ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক*-এ ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অচিরেই নৃবিজ্ঞানে প্রধান একটা বিতর্ক দেখা দেয় প্রচলিত অর্থশাস্ত্র আদৌ শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের বাইরের সমাজের জন্য প্রযোজ্য কিনা।

এভাবে অর্থশাস্ত্রের পরিধির বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের সূচনা ঘটে। যদিও. আগেই উল্লেখ করেছি যে এই ধারণাটি একটা শাখা হিসেবে চিহ্নিত হয় আরও পরে। যাই হোক, চল্লিশ পঞ্চাশের দশক থেকে নৃবিজ্ঞানে প্রধান একটা বিতর্ক দেখা দেয় প্রচলিত অর্থশাস্ত্র আদৌ ইউরোপের শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের বাইরের সমাজের জন্য প্রযোজ্য কিনা। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র যে তত্ত্ব এবং পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে থাকে তা দিয়ে অপশ্চিমের ঐ সমাজগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বোঝা যায় কিনা। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে তখন প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে সকল সমাজের জন্য সমানভাবে কার্যকরী মনে করলেও বড়সড় চ্যালেঞ্জ আসতে শুরু করে অন্য কিছু নৃবিজ্ঞানীর কাজের মাধ্যমেই। এই বিতর্ক চলতে চলতেই নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা মার্ক্সবাদী পদ্ধতি নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা একেবারে ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান চালু করলেন। এভাবে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান খুব সহজেই নানান তত্ত্ব ও তর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল। একটা ব্যাপারে এই সকল তাত্ত্বিক ধারার মিল ছিল। তা হচ্ছে: প্রতিটি ধারাই বিভিন্ন সমাজের প্রত্যক্ষ উদাহরণ হাজির করেছে। ফলে উভয় পক্ষই তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে মাঠ পর্যায়ের উদাহরণ হাজির করেছেন। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান কেবল অপশ্চিমা সমাজ বা ভারী শিল্পবিহীন সমাজ (প্রথম যুগের নৃবিজ্ঞানীদের ভাষায় *সরল* সমাজ) নিয়েই কাজ করেনি। বরং বর্তমানে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের নানাবিধ কর্মকান্ড, আচরণ এবং অনুশীলন নিয়ে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান কাজ করেছে। সংক্ষেপে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হ'ল:

ক) প্রচলিত অর্থশাস্ত্র যে সকল সমাজের উপর মনোযোগ দেয় (পশ্চিমা সমাজ কিংবা বাজারভিত্তিক সমাজ/শিল্পভিত্তিক সমাজ/পুঁজিবাদী সমাজ) অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান তার বাইরের পরিসরে কাজ করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রে বাদ পড়ে গেছে যে সব সমাজ তা নিয়েই এই শাখার যাত্রা শুরু। সেদিক থেকে বিষয়বস্তুর ভিন্নতার মাধ্যমে অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য রয়েছে।

খ) পৃথিবীর সকল সমাজেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও কর্মকান্ড আছে – এই উপলব্ধি নিয়েই অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান কাজ শুরু করেছে। বিভিন্ন সমাজের আর্থনীতিক কর্মকান্ডের মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতা আছে। কিন্তু কেবল পুঁজিবাদী সমাজের কর্মকান্ডকেই অর্থনৈতিক বলে ভাবার বিরোধিতা করে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান।

গ) পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য প্রচলিত অর্থশাস্ত্রে যে সব তত্ত্ব ও পদ্ধতি দেখা দিয়েছে তা দিয়ে অন্যান্য সমাজ বোঝা যাবে কিনা তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক দেখা দিয়েছে এই শাখায়।

ঘ) বর্তমান কালের অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান নগরভিত্তিক এবং গভীরভাবে বাজারভিত্তিক সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়েও অধ্যয়ন করে থাকে। তবে এখানে মনে রাখা দরকার বর্তমান কালে নৃবিজ্ঞানের এই শাখাটির আর আগের মত গুরুত্ব নেই – যেমন ছিল '৫০, '৬০ বা '৭০-এর দশকে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন চলে আসে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বলতে কি বোঝায়। নিচের আলোচনার মাধ্যমে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও আর্থব্যবস্থা

অর্থশাস্ত্রের জগতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বলতে কেবল বাজার ও বাজার সংক্রান্ত বিষয় বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে লক্ষ্য রাখা দরকার যে অর্থশাস্ত্র (Economics) যখন বিকাশ লাভ করেছে তখন ইউরোপের সমাজগুলোতে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। সেটা আঠারো শতকের কথা। তাছাড়া সেই সব সমাজে তখন মুনাফা বা লাভের জন্য নানাবিধ রকম দ্রব্য উৎপাদন চালু হয়েছে।

সেইসব দ্রব্য তৈরি করে বাজারে তা বিক্রী করা হয় এবং এর মধ্য দিয়ে শিল্প-কল-কারখানার মালিকেরা বিপুল পরিমাণ লাভ করে থাকে। আবার ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন থাকায় ক্রেতাদের পক্ষেও তা কিনতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায় অর্থশাস্ত্র এই দুই কর্মকান্ড – **কারখানায় উৎপাদন** এবং **বাজারে ক্রেতাদের কেনাকাটা** – এর উপর মনোযোগ দিয়ে এসেছে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমাজে গবেষণা করতে গিয়ে গোড়াতেই বুঝতে পারলেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে এরকম সীমাবদ্ধ করে বোঝা যাবে না।

অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান সে কারণে গোড়াতেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করল।

তাঁদের চিন্তা-ভাবনা গড়ে ওঠার পেছনে কিছু বিষয় কাজ করেছে। প্রত্যেকটা সমাজেই মানুষ কিছু না কিছু উৎপাদন করে থাকে। এই উৎপাদন প্রাথমিকভাবে খাবার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আর এর পর বাসস্থানের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক সমাজে নানাবিধ ধরনের দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে যেগুলো মূলত ভোগ্য দ্রব্য। কিন্তু এর বিপরীতে খাবার এবং বাসস্থানের জন্য কিছু উৎপাদন সকল সমাজেই হয়ে থাকে। মানুষ খাবারের তাগিদ থেকেই খাদ্য উৎপাদন করে। থাকবার তাগিদ থেকেই কিছু জিনিস বানায়। সেটা সকল সমাজের জন্যই বাস্তব। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান সে কারণে গোড়াতেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে বোঝার চেষ্টা করল। উৎপাদনকে ঘিরে আরও কিছু ধারণা বোঝা দরকার হয়ে পড়ে। কারণ উৎপাদন হবার পরে সেগুলো কি প্রক্রিয়ায় সমাজের সদস্যদের হাতে পৌঁছায় সেটাও একটা মূল জিজ্ঞাসা। একে কেন্দ্র করেই অন্য ধারণা গুলো হচ্ছে – **বিনিময়** এবং **বণ্টন**। আসলে বিনিময় এবং বণ্টন দুটো দুই বিষয় হলেও একটার সঙ্গে একটা সম্পর্কিত। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র পাঠ রয়েছে। তাই এখানে সে বিষয়ে আলাদা করে কোন আলোচনা করা হচ্ছে না। আপাতত কেবল এটুকু খেয়াল রাখা দরকার যে, কোন একটি সমাজ, দল বা মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় সকল কিছুই উৎপাদন না করতে পারে। তাহলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিগুলো অন্যত্র হতে সংগ্রহের জন্য একটা বিনিময় করতে হবে। সেটা আধুনিক কালের টাকার ব্যবস্থায় হোক। আর অন্য কোন ব্যবস্থায় হোক। আবার বিনিময় করে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেউ পাবেন কিনা তা নির্ভর করছে তাঁর/তাঁদের কাছে কি পরিমাণ সম্পদ আছে এবং সেই সম্পদের বিনিময় মূল্য কত – তার উপর। কিন্তু তাঁর হাতে সম্পদের পরিমাণ এবং এর বিনিময় মূল্য একেবারেই বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করছে। ফলে একটা অন্যটার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্য দিয়েই সমাজে ভোগের পার্থক্য তৈরি হয়। অর্থাৎ সমাজের মানুষের মধ্যে কে বেশি সম্পদ ভোগ করছেন আর কে তা করতে পারছেন না তার সবই গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে **ভোগ** ধারণাটিও দরকার হয়ে পড়ছে।

কোন সমাজের মানুষজনের উৎপাদন ও এই সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। আর উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ এই সকল মিলে যে একটা ব্যবস্থা তৈরি হয় – সেটাই আর্থব্যবস্থা।

তাহলে যে কোন সমাজের মানুষজনের উৎপাদন ও এই সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকান্ডই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। আর উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময়, ভোগ এই সকল মিলে যে একটা ব্যবস্থা তৈরি হয় – সেটাই আর্থব্যবস্থা। মার্ক্সবাদী নৃবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে একটা ধারণা ব্যবহার করে থাকেন – উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production)। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান শাখাটি বিশ শতকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা যখন এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেন তখন নৃবিজ্ঞানীদের পুরোনো গবেষণা থেকেও উদাহরণ টানেন এবং সে সমস্ত কাজের মধ্যকার তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ তুলে আনেন। আপনারা আগেই জেনেছেন অনেকেই অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানকে অর্থনীতি এবং নৃবিজ্ঞানের সমন্বয় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে নৃবিজ্ঞানের এবং অর্থশাস্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতি তেমন একটা একত্রিত হয়নি। প্রধান সমস্যা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ আর অন্যান্য সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ভাবনা-চিন্তা এবং বাস্তব চর্চার বিশাল ফারাক আছে। আর অর্থশাস্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই মূলত লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। সে কারণেই সমন্বয়ের ব্যাপারটা মূলত স্বপ্নই রয়ে গেছে। এই একই প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের মধ্যেও তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে।

প্রথাবাদী (formalist) আর বাস্তববাদী (substantivist) বিতর্ক

এতক্ষণের আলোচনায় এটা বোঝা গেছে যে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান কোন একটি সমাজের উৎপাদন এবং বণ্টন সংক্রান্ত নানাবিধ দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। যেহেতু উৎপাদনের সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ বিষয় জড়িত তাই অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিধি মোটেই সংক্ষিপ্ত নয়। কিন্তু দীর্ঘ সময়কাল ধরে নৃবিজ্ঞানীরা একেবারেই অপশ্চিমা সমাজে কাজ করে গেছেন। ফলে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের আলাপ-আলোচনায় কেবলমাত্র এমন ধরনের সমাজ বিবেচিত হয়েছে যা কিনা শিল্পভিত্তিক নয়। কিন্তু প্রাক্-শিল্প সমাজের গবেষণার মধ্যেও ব্যাপক বিতর্ক দেখা দেয়। এই বিতর্কের মূল জায়গা হচ্ছে: প্রচলিত অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে অন্যান্য অপশ্চিমা সমাজের আর্থব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা। আগেই জেনেছেন ইউরোপের নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এইসব সমাজ ছিল "সরল" বৈশিষ্ট্যের।

যে সকল নৃবিজ্ঞানীরা অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত তত্ত্ব ও সূত্র দিয়ে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের আর্থব্যবস্থা বুঝতে চেয়েছেন তাঁদেরকে ফর্মালিস্ট বা প্রথাবাদী বলা হয়ে থাকে।

ম্যালিনোস্কি ছাড়াও ব্রিটেনের রেমন্ড ফার্থ এবং অন্ডে রিচার্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেলভিন্স হার্সকোভিট্স এবং সল ট্যাক্স অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। এটা ঠিক যে, ম্যালিনোস্কি যখন কাজ করেন তখন একটা শাখা হিসেবে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিচয় গড়ে ওঠেনি। কিন্তু সমগ্র সমাজের বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে আর্থব্যবস্থা প্রসঙ্গ এসেছে। প্রথম পর্যায়ের এই সকল তাত্ত্বিক-চিন্তকরাই স্পষ্টভাবে প্রচলিত অর্থনীতির তত্ত্ব দিয়ে অপাশ্চাত্যের সেইসব সমাজের আর্থব্যবস্থা বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের ভাষায় "উপজাতীয়" (ট্রাইব্যাল) এবং কৃষক আর্থব্যবস্থা। যে সকল নৃবিজ্ঞানীরা অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত তত্ত্ব ও সূত্র দিয়ে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের আর্থব্যবস্থা বুঝতে চেয়েছেন তাঁদেরকে ফর্মালিস্ট বা প্রথাবাদী বলা হয়ে থাকে। বিতর্কের জোরালো সূচনা ঘটে যখন কার্ল পোল্যানয়ি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *ট্রেড এ্যান্ড মার্কেট ইন আর্লি এম্পায়ার* প্রকাশ করেন। এখানে তিনি পূর্বসূরী সকল অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানীদের কঠোর সমালোচনা করেন যে তাঁরা কোনরকম সমালোচনা ছাড়াই যাবতীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বকে সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য মনে করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন পুঁজিবাদী সমাজের সঙ্গে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের আমূল ভিন্নতা রয়েছে। এই ভিন্নতা কেবল অগ্রসরতার নয় বলে তিনি যুক্তি দেখান, বরং একেবারে অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার মুখ্য, প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পোল্যানয়ির মতে, উপহার বা নানান আনুষ্ঠানিক বিনিময় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছে। এই প্রেক্ষিতে তিনি বিনিময় পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করেন: পারস্পরিক লেনদেন, পুনর্বণ্টন এবং বাজার। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক পদ্ধতিকে বুঝবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধারণাগত রাস্তা ও সূত্রাবলী প্রয়োজন। বিনিময় পদ্ধতি পোলেনি এবং তাঁর অনুসারীদের কাছে (যেমন, জর্জ ড্যাল্টন, মার্শাল সাহ্লিন্স) কেন্দ্রীয় স্থানে রয়েছে। তাঁদের চিন্তাধারাকে সাব্স্ট্যান্টিভিস্ট বা বাংলায় বাস্তববাদী বলা হয়েছে। এখানে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। ফর্মালিস্ট ও সারস্ট্যান্টিভিস্ট শব্দদুটোর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে প্রথাবাদী ও বাস্তববাদী। এই তর্জমা খুবই বিভ্রান্তিকর। বাংলায় এই শব্দদুটোকে যথাক্রমে 'অর্থশাস্ত্রীয়' ও 'সংসৃতিমুখিন' বা 'সংসুতিবাদী' বললে আরও সুবিধা হত। তবে বর্তমান লেখায় প্রচলিত শব্দদুটোই ব্যবহার করা হয়েছে।

কখনো একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং কখনো কোন একটা মাত্র উৎপাদন কারখানাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে।

এখানে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন বিশেষ কোন্ ব্যাখ্যাতে বাস্তববাদী এবং প্রথাবাদীরা ভিন্ন। অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত চিন্তাভাবনাতে খুবই জরুরী একটা ধারণা হচ্ছে যৌক্তিক আচরণ। যৌক্তিক আচরণ প্রসঙ্গ বুঝতে গেলে নয়া ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটা জায়গা লক্ষ্য করতে হবে। তা হচ্ছে: এখানে সকল ভাবনাচিন্তার কেন্দ্রে আছে এককের ধারণা। এর মানে হচ্ছে কখনো একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এবং কখনো কোন একটা মাত্র উৎপাদন কারখানাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে। যৌক্তিক আচরণ বলতে স্পষ্টভাবে সর্বোচ্চকরণের (maximisation) ধারণা জড়িত। অর্থনীতির তত্ত্বে দেখা হয় ক্রেতা বা ভোক্তা হিসেবে কোন ব্যক্তি তাঁর সর্বোচ্চ লাভ নিশ্চিত করতে চান। একইভাবে কোন উৎপাদন কারখানা চায় কোন দ্রব্য উৎপাদন করে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে। এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই একটা আর্থব্যবস্থা জারী থাকে। সারাংশে এই হচ্ছে অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সূত্রের একটা মূল বক্তব্য। প্রথাগত অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন যে, এই প্রক্রিয়াটি সমানভাবে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানেই বাস্তববাদীদের আপত্তি। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে:

কোন একটি সমাজের, বিশেষভাবে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের, মানুষের আর্থনীতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে ঐ সমাজের নির্দিষ্ট কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান এবং রীতি-নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। জ্ঞাতিসম্পর্ক বা ধর্মের মত বিষয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে থাকে। এক্ষেত্রে তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজের উদাহরণ টেনেছেন। যেমন, ম্যালিনোস্কির কাজে কুলাপ্রথাকেও তাঁরা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার **কোয়াকিউটাল** সমাজে পুনর্বণ্টনকেও উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী পাঠে কিছু আলাপ করার সুযোগ রয়েছে। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। উৎপাদন অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ভাবনা হলেও প্রথাবাদী ও বাস্তববাদীদের চিন্তাভাবনার পার্থক্য খেয়াল করা যায় বিনিময়ের প্রশ্নে। যেখানে প্রথাবাদীদের আগ্রহের মূল জায়গা হচ্ছে ব্যক্তির আচরণ সেখানে বাস্তববাদীদের আগ্রহের জায়গা হচ্ছে বিনিময়ের ধরন। ব্যক্তির আচরণ সেখানে সমাজের নিয়ম-নীতির বাইরের বিষয় নয়।

মার্ক্সবাদী ধারা

প্রথাবাদী-বাস্তববাদী এই বিতর্কের বাইরে মার্ক্সবাদী ধারা বরাবরই স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে থেকেছে। মার্ক্সবাদী চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে **উৎপাদন পদ্ধতি** (mode of production)। পুঁজিবাদী এবং প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থাকে সমন্বিত করে ভাবা হয়। উৎপাদন পদ্ধতি কেন্দ্রিক এই চিন্তাভাবনা নয়া ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছু বিষয় স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন, সেসব তত্ত্বে উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগ যেভাবে বিভাজিত মার্ক্সবাদী চিন্তায় এই রকম বিভাজিত করে ভাবা হয় না। বরং এই চিন্তায় উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যা কিছু উপাদান আছে – ভূমি, যন্ত্রপাতি এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, পুঁজি, দক্ষতা ইত্যাদি – সবগুলোকে একত্রে **উৎপাদনের উপায়** হিসেবে বোঝা হয়ে থাকে। এই উৎপাদনের উপায়ের উপর দখল, এর মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সমাজের মানুষজনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে থাকে, আর সেটা একটা অসম ব্যবস্থা। তাকে বোঝা হয় **উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক** হিসেবে। উৎপাদনের উপায় এবং উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক একত্রে মিলেই কোন সমাজের সমগ্র সমাজ-আর্থনীতিক গঠন তৈরি করে থাকে। ফলে মার্ক্সবাদী চিন্তা অনুযায়ী এই বিশ্লেষণের রাস্তাতেই প্রাক্-পুঁজিবাদী কিংবা পুঁজিবাদী সমাজ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রধান পার্থক্য সূচিত হবে উৎপাদনের উপায়ের উপর।

মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণের একটা প্রধান জায়গা হচ্ছে শ্রম। এই চিন্তাটাই অন্যান্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে মার্ক্সবাদকে স্বতন্ত্র করেছে। শ্রমের প্রসঙ্গের সাথেই সেখানে চলে আসে ক্ষমতার প্রসঙ্গ। এর মানে হ'ল: কোন সমাজে শ্রম কিভাবে মূল্যে রূপান্তরিত হয় এবং সেই মূল্যটা সমাজের কারা দখল করবার সামর্থ্য বা ক্ষমতা রাখে। এই প্রশ্নটা একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। ফলে মার্ক্সবাদী অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানকে বুঝতে চাইলে রাজনৈতিক উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যাঁরা শ্রম প্রদান করেন তাঁদেরকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসা মার্ক্সবাদী চিন্তার একটা মৌলিক জায়গা বলে বিবেচিত হতে পারে।

সাম্প্রতিক কালের নগর সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে নানারকম ভোগ্য-পণ্যের বিশাল বিস্তার ঘটেছে। ... সেই প্রসঙ্গে ক্রেতা-আচরণ একটা সুস্পষ্ট জায়গা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের।

সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের সম্ভাবনা

এখানে খুব সংক্ষেপেএকটা বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। এখন পর্যন্ত আপনারা আলোচনায় লক্ষ্য করেছেন যে, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানে উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়াদি, বণ্টন এবং বিনিময় সংক্রান্ত নানা বিষয়াদি আলোচনায় এসেছে। একই সঙ্গে ভোগ এবং সর্বোচ্চকরণের ব্যাখ্যাও আলোচনায় এসেছে। কিন্তু গড়পরতায় প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজেই নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগ ছিল। এই মুহূর্তে আজকের কালে বসে এই প্রশ্নটা খুবই জরুরী যে আধুনিক কালের পুঁজিবাদী সমাজে, অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান কি ধরনের গবেষণা বা অধ্যয়ন করতে পারে।

সাম্প্রতিক কালের নগর সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে নানারকম ভোগ্য-পণ্যের বিশাল বিস্তার ঘটেছে। আর এই সব ভোগ্য-পণ্যের ক্রেতা হিসেবে নগরের একটা নির্দিষ্ট শ্রেণী স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই প্রসঙ্গে ক্রেতা-আচরণ একটা সুস্পষ্ট জায়গা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের। এর পাশাপাশি পণ্যনির্মাতারা নানা উপায়ে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর

মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই প্রক্রিয়াও অধ্যয়নের খুব সম্ভাবনাময় জায়গা। সব মিলে বর্তমান কালের বিশাল পণ্যবাজার আর তার নির্মাতা ও ক্রেতা নিয়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের মনোযোগ দেবার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সে রকম কিছু কাজ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী করছেন। তবে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের প্রচলিত চেহারা দিয়ে তা বোঝা সম্ভব নয়।

সারাংশ

নৃবিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনায় সকল সমাজেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড রয়েছে। এই চিন্তা থেকে তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেছিলেন। নৃবিজ্ঞানের এই শাখাকে অনেকেই অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান বলে থাকেন। এখানে কোন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হয়। উৎপাদনের সাথে সাথেই বন্টন এবং ভোগের ধারণা চলে এসেছে। সেই সাথে সমাজের নানা নিয়ম-কানুন। এই কাজে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বিতর্ক দেখা দেয়। তা হচ্ছে: অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত তত্ত্ব শিল্পভিত্তিক ইউরোপীয় পুঁজিবাদী সমাজের বাইরের সমাজের জন্য প্রযোজ্য কিনা। এই তর্ককে প্রথাবাদী-বাস্তববাদী বিতর্ক হিসেবে বলা হয়ে থাকে। মার্ক্সবাদী ধারা সবসময়েই স্বতন্ত্র ছিল। সেই ধারার গুরুত্বের জায়গা হচ্ছে শ্রম এবং মানুষের সম্পর্ক। বর্তমান কালে ভোগ্যপণ্য এবং বিশেষভাবে স্বচ্ছল শ্রেণীর ক্রেতা-আচরণ গবেষণার জায়গা হতে পারে। কিন্তু প্রথাগত অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে তা সম্ভব হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্‌ল ম্যালিনোস্কি তাঁর কোন বই -এ ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করেছেন?
ক. ম্যাজিক, সায়েন্স এন্ড রিলিজিয়ন
খ. আরগোনাটস অব দ্য ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক
গ. এ ডায়েরী ইন দ্য স্ট্রিক্ট সেন্স অফ দ্য টার্ম
ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানী পোল্যানয়ি বিনিময় পদ্ধতিকে কত ভাগে ভাগ করেছেন?
ক. ২ ভাগে
খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে
ঘ. ৫ ভাগে

৩। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান শাখাটি কোন শতকে বিকাশ লাভ করে?
ক. ১৮ শতক
খ. ১৯ শতক
গ. ১৮ ও ১৯ শতক
ঘ. বিশ শতক

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের পরিচয় দিন।
২। আর্থব্যবস্থা বলতে আপনি কী বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিতর্ক কী ছিল?
২। বর্তমান কালে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের কাজ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

পাঠ - ২

প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা
Pre-capitalist Economy

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- বর্তমান বাজার ব্যবস্থা প্রচলনের আগে পৃথিবীতে নানা ধরনের আর্থব্যবস্থা চালু ছিল
- প্রযুক্তি এবং পরিবেশকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় চার ধরনের প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থার কথা বলা হয়
- প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থায় সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের ঝোঁক ছিল

সকল ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ও 'এখন পর্যন্ড় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট' ধরে নেয়া হয়েছে।

আগের পাঠ থেকে আপনারা জানেন নৃবিজ্ঞানে আর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সমাজের উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগের আলোচনা করা। এগুলোর ভিত্তিতে নানান সমাজের আর্থব্যবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, নানান সমাজে উৎপাদন করবার উপায়, বণ্টনের নিয়ম এবং ভোগের ধরন এক ও অভিন্ন নয় – এই চিন্তাই নৃবিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করেছে আর্থব্যবস্থা অধ্যয়ন করতে। কিন্তু এখানে আবারও খেয়াল রাখা দরকার যে, প্রাথমিকভাবে ইউরোপীয় নৃবিজ্ঞানীরাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা করতে গেছেন। আর তাঁদের চিন্তায় ইউরোপের ব্যবস্থাই স্বাভাবিক ছিল। যে সময়কালে এই সকল নৃবিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গেছেন সেই সময়কালে ইউরোপের আর্থব্যবস্থা গভীরভাবে পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্যের ছিল। এবং নৃবিজ্ঞানীরা সেটাকেই সকল সমাজের জন্য স্বাভাবিক মনে করেছেন। ফলে অপরাপর যে সকল আর্থব্যবস্থা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল সেগুলোকে কিভাবে আলোচনা করা যাবে সেটা একটা গভীর মনোযোগের বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। এর ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নানান আর্থব্যবস্থা নিয়ে তুলনামূলক আলাপ-আলোচনা গড়ে উঠতে। এ সকল ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের ভাবনা-চিন্তা নিছক একই রকম ছিল না। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ও 'এখন পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট' ধরে নেয়া হয়েছে। এটা আমরা নামকরণ থেকেই বুঝতে পারি। লক্ষ্য করে দেখুন, প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা বলার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে কাম্য ও স্বাভাবিক হিসেবে দেখা হয়েছে।

নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থা পাঠ করবার ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই দুই ধারার মধ্যে অমিলের মতো মিলও প্রচুর – সে কথা আগের আলোচনাতেই পরিষ্কার। একটি ধারা অনুযায়ী প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সেই অনুযায়ী প্রযুক্তির ভেদে আর্থব্যবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, এখানে আর্থব্যবস্থার ভিন্নতার জন্য মূলত পরিবেশকে দায়ী করা হয়। কোন একটি অঞ্চলের পরিবেশের ভিন্নতায় সেখানকার মানুষজন ভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অবলম্বন করে থাকেন, ফলে সেখানে আর্থব্যবস্থা অন্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন হয়ে থাকে – এই হচ্ছে মূল যুক্তি। এই ধারাকে মোটামুটি পরিবেশকেন্দ্রিক ক্রিয়াবাদী ধারা বলা যেতে পারে। অন্য ধারাতে মূল যুক্তি হচ্ছে: মানুষের মধ্যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন আর্থব্যবস্থা চালু থাকলেও সেগুলো কালক্রমে বদলাতে থাকে। একটি ব্যবস্থা থেকে আর একটি ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট এবং সেই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার দিকে আর্থব্যবস্থা যেতে থাকে। এই ধারাকে বিবর্তনবাদী ধারা বলা যেতে পারে। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই অনুসারী প্রথম ধারার। কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে, এই দুই ধারার একটা প্রধান মিল হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই আর্থব্যবস্থা বিবেচনা করার সময় সমাজে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কয়েকটি ভাগে আর্থব্যবস্থাকে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলি বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে থাকে। অর্থাৎ, ধরে নেয়া হয় কোন একটি আর্থব্যবস্থা কালক্রমে অন্য আর্থব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। নিচে সেগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো।

শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ (hunting and gathering societies)

এই সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার ও সংগ্রহের উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে এটা পরিষ্কার যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে অধিক সময় ধরে এই ধরনের আর্থব্যবস্থা ছিল বলে নৃবিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছেন। তাঁদের মতে ইতিহাসের ৯৯% সময় কাল ধরে খাদ্য সংগ্রহের এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। নৃবিজ্ঞানী লী এবং ডেভোর ১৯৬৮ সালে মত প্রকাশ করেছেন যে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে শিকার-সংগ্রহ প্রণালী পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি। কারণ, পরিবেশের বিপর্যয় কিংবা যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত নানাবিধ অনিশ্চয়তা আছে কৃষিভিত্তিক এবং শিল্পভিত্তিক সমাজের ক্ষেত্রে। এখানে একটা বিষয়ে সতর্কতার দরকার আছে। যদিও কিছু নৃবিজ্ঞানী খুবই গুরুত্বের সাথে শিকার-সংগ্রহ সমাজ নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার কোন শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের সঙ্গে প্রাচীন কালের শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজকে গুলিয়ে না ফেলা খুবই জরুরী। নৃবিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে বর্তমান কালের কোন শিকারী-সংগ্রহকারী দল কৃষিভিত্তিক মানুষজনের সাথে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নেই, থাকতে পারে না। একই সঙ্গে তাঁরা বলছেন, বর্তমান কালের শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের তথ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সমাজের কোনও প্রমাণ হাজির করা ঠিক নয়।

কেবলমাত্র শিকারী সমাজ বললে নারীদের শ্রমকে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়। কারণ, এরকম সমাজে এই নজির খুবই স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে যে, নারীরা সাধারণত ফলমূল সংগ্রহের কাজ করে থাকেন।

একটা সময়ে এই ধরনের সমাজকে কেবল শিকারী সমাজ বলা হ'ত। পরবর্তী কালে নৃবিজ্ঞানীরা অনেকেই পরিষ্কার করে বলেছেন, যে সকল সমাজে শিকার খাদ্য যোগাড়ের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য সে সকল সমাজে একই সাথে সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর মানে হ'ল: কেবলমাত্র পশু-পাখি শিকার করে প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগাড় হয় না, ফলমূলও সংগ্রহ করতে হয়। বরং, কেবলমাত্র শিকারী সমাজ বললে নারীদের শ্রমকে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়। কারণ, এরকম সমাজে এই নজির খুবই স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে যে, নারীরা সাধারণত ফলমূল সংগ্রহের কাজ করে থাকেন। খাদ্যের প্রধান যোগান উদ্ভিজ্জ সংগ্রহের মধ্য দিয়েই আসে। সাম্প্রতিক কালের দুনিয়ায় শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের জন্য প্রকৃতি-পরিবেশ খুবই সীমিত হয়ে এসেছে। নৃবিজ্ঞানী মারডক গত শতকের মাঝামাঝি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের একটা সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় – ক) আফ্রিকা: বুশমেন, কোরোকা, পিগমি, পূর্ব আফ্রিকার শিকারী সমাজ, ইথিওপীয় শিকারী সমাজ; খ) এশিয়া: সাইবেরীয় শিকারী সমাজ, ভারতীয় শিকারী সমাজ, ভেদ্দা শিকারী সমাজ, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় শিকারী সমাজ, নেগরিটো; গ) ওশেনিয়া: অস্ট্রেলীয় আদিবাসী; ঘ) উত্তর আমেরিকা: এস্কিমো, উত্তর-পূর্ব এ্যালগোনকোয়ান্স, উত্তর-পশ্চিম আথাপাসকান্স, প্লেটো ইন্ডিয়ান, ক্যালিফোর্নিয়া ইন্ডিয়ান, গ্রেট বেসিন, গাল্ফ ইন্ডিয়ান, এ্যাপাচি, সেরি; ঙ) দক্ষিণ আমেরিকা: ওয়ারাউ, দক্ষিণ ভেনেজুয়েলার গহীন আদিবাসী, আমাজনের শিকারী সমাজ, পূর্ব ব্রাজিলের শিকারী সমাজ ইত্যাদি।

সাধারণভাবে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের সঙ্গে ব্যান্ড ব্যবস্থার সমাজ মিলিয়ে দেখা হয়। কিন্তু এই হিসেবটা সব সময় অর্থবহ নয়। এই ধরনের সমাজে কি ধরনের স্বচ্ছলতা ছিল তা বোঝা যায় নৃবিজ্ঞানী মার্শাল সাহলিন্সের একটা মন্তব্য থেকে। তিনি এই ধরনের সমাজকে **'সত্যিকার সমৃদ্ধ সমাজ'** বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে একটা তর্ককে খেয়াল রাখা দরকার। অনেক নৃবিজ্ঞানীই শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজকে দুর্দশাগ্রস্ত এবং প্রকৃতির বৈরিতার সম্মুখীন

কার্টুন

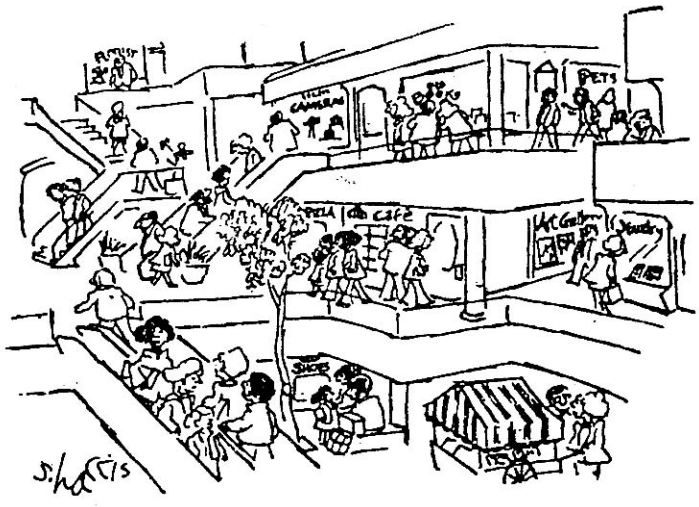

শিকারী-সংগ্রহকারী, উত্তর আমেরিকা, বিংশ শতকের শেষভাগে (দি নিউ ইয়র্কার, অক্টোবর ১৭, ১৯৮৮)

সূত্র: এম্বার এবং এম্বার, ১৯৯০

হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীতে কৃষিব্যবস্থার বিস্তারের পর প্রকৃতির উৎকৃষ্ট অংশ এই ব্যবস্থার অধীন হয়ে গেছে। ফলে নৃবিজ্ঞানীরা এমন একটা পরিস্থিতিতে শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজও আবিষ্কার, করেছেন যখন প্রকৃতির চমৎকার জায়গাগুলো আর তাঁদের আয়ত্তে নেই, তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। সাহলিনস বিভিন্ন রকম ঐতিহাসিক এবং জাতিতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত ঘাঁটাঘাঁটি করে যুক্তি দেন যে, এই ধরনের সমাজের সদস্যরা তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য খুবই অল্প সময় কাজ করে থাকেন। ফলে তাঁদের জীবন যাপনে অনেকটা অবসর পেয়ে যান। তিনি আরও বলেন, শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ প্রধানত যাযাবর ধরনের এবং এদের জীবনে খুব সামান্যই ব্যক্তিগত দখলী জিনিস আছে। সাধারণভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাই তেমন কাজ করে না। একই সাথে সঞ্চয় বা জমিয়ে রাখারও বালাই নেই। এভাবে সাহলিনস মনে করেন এই সমাজগুলোই সত্যিকার সমৃদ্ধ সমাজ। বর্তমান কালের শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের উপর যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা যায় আসলেই এ সকল সমাজের মানুষজন খুবই অল্প সময় কাজ করে তাঁদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। দৈনিক ২ থেকে ৪ ঘণ্টা তাঁরা কাজ করে থাকেন এবং বাড়তি যে খাদ্যের যোগান থাকে সেগুলো ধ্বংস করে থাকেন। এখানে এ কথা মনে রাখারও প্রয়োজন আছে, বর্তমান কালের বহু শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ পরিবেশ ও প্রকৃতির নিদারুণ চাপের মধ্যে আছেন। সেটা ঘটেছে কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের চাপে। তবুও সাহলিনসের ভাবনা-চিন্তা ও যুক্তির গুরুত্ব আছেই।

*মার্শাল সাহলিন্‌স শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজকে **'সত্যিকার সমৃদ্ধ সমাজ'** বলে আখ্যায়িত করেছেন।... বিভিন্ন রকম ঐতিহাসিক এবং জাতিতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত ঘাঁটাঘাঁটি করে যুক্তি দেন যে, এই ধরনের সমাজের সদস্যরা তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য খুবই অল্প সময় কাজ করে থাকেন।*

পশুপালক সমাজ (pastoralist societies)

পশুপালক সমাজ বলতে বোঝায় তাঁদের যাঁরা খাদ্য উৎপাদনের জন্য পশু পালনের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল থাকেন। পালন করা এ সমস্ত পশুর মধ্যে আছে গরু-মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, ইয়াক, উট ইত্যাদি। যে সকল পশু একাধারে দুধ এবং মাংস সরবরাহ করতে পারে সেগুলোই পশুপালন সমাজে প্রতিপালিত হয়। সাধারণভাবে নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে পশুপালনের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, ঘাসী-জমি, পাহাড়, মরুভূমি ইত্যাদি। অর্থাৎ, যে সমস্ত এলাকাতে কৃষি বা উদ্যান-কৃষির কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, এই ধরনের খাদ্য-উৎপাদনের সমাজগুলো চলে ফিরে বেড়াবার জন্য বিস্তর একটা এলাকা পেয়ে থাকে। তাছাড়া তাঁদের পোষ মানানো পশুর জন্য ঘাস পাওয়ার ব্যবস্থা ঐ জমি থেকেই হয়। পোষা জীবজন্তুর যে নামগুলো বলা হ'ল তার প্রায় সবই পুরানো

পশুপালক সমাজ... খাদ্য উৎপাদনের জন্য পশু পালনের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল থাকে।

দুনিয়ার। নতুন দুনিয়া, মানে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপারে (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ) তেমন কোন জন্তু পোষ মানাতে পারেনি মানুষ। ব্যতিক্রম হচ্ছে পেরুতে লামা এবং আলপাচা নামের দুইটি প্রাণী। ফলে পশুপালন সমাজ পুরানো দুনিয়া থেকেই পাওয়া যায় বলে নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করেছেন। পশুপালন সমাজের উল্লেখযোগ্য যে উদাহরণ পাওয়া যায় তা হচ্ছে: পূর্ব আফ্রিকা – গবাদিপশু বা গরু-মহিষ পালন করা হয়, উত্তর আফ্রিকা – উট পালন করা হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া – ছাগল ও ভেড়া পালন করা হয়, মধ্য এশিয়া এবং উপ-সুমেরু এলাকায় (sub arctic) – কারিবু এবং বল্‌গা হরিণ পালন করা হয়। তবে এই হিসেব নিকাশের সময় খেয়াল রাখা প্রয়োজন নৃবিজ্ঞানীরা এ সকল সমাজ-আবিষ্কার, করেছেন এমন একটা সময়কালে যখন ইউরোপে শিল্পভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব সমাজের উদাহরণ দিয়ে প্রাচীন কালের কোন সমাজকে বুঝতে চাওয়া ঠিক হবে না। সতর্ক থাকা দরকার এই কারণে যে, অনেক নৃবিজ্ঞানীই শিকারী সমাজের পর পশুপালন সমাজকে একটা বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেছেন যে, শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজের দিকে রূপান্তরিত হবার পথে এই ধাপটি দেখা দিয়েছে।

পশুপালন সমাজ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় বিচরণ করে থাকে যাকে আমরা যাযাবর সমাজ বলে থাকি। তবে কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর মতে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাবার ব্যাপারটা দুই ভাবে ঘটে: **স্থানান্তর** এবং **যাযাবরী**। কোন পশুপালক সমাজ সারা বছর ধরে বিভিন্ন এলাকায় পশুর দলকে চরিয়ে নিয়ে বেড়ালে তাকে স্থানান্তর বলা হয়। যে এলাকায় যখন ঘাসী জমি পাওয়া যায় সেখানে পশুর দলকে নিয়ে যান তাঁরা। সাধারণত পুরুষেরা চরানোর কাজ করে থাকেন। পূর্ব আফ্রিকার **মাসাই** জাতি এই ধরনের উদাহরণ। পক্ষান্তরে, যে সকল পশুপালক সমাজ সকল সদস্য, পালিত জন্তু-জানোয়ার সমেত এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিচরণ করে থাকে তাদেরকে যাযাবর বলা হয়। পশ্চিম ইরানের দক্ষিণ জাগরোস পর্বতমালায় **বাখতিয়ারি** জাতি এরকম উদাহরণ।

উদ্যান-কৃষি সমাজ (horticulturist societies)

এই ব্যবস্থায় কোন জমি নিরন্তর কিংবা চিরস্থায়ী হিসেবে চাষাবাদে ব্যবহৃত হয় না। বরং, একবার চাষ হবার পর কিছুকাল তা অনাবাদী বা পতিত জমি হিসেবে ফেলে রাখা হবে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে উদ্যান-কৃষি সমাজের মূল পার্থক্য হচ্ছে প্রযুক্তিতে। যদিও কখনো কখনো কৃষি বলতে সাধারণভাবে যে কোন ধরনের চাষকেই বোঝায় – এমনকি উদ্যান-কৃষিও, কিন্তু উদ্যান-কৃষিকে কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে আলাদা রাখা হয়ে থাকে। উদ্যান-কৃষির বৈশিষ্ট্য হ'ল: এই ব্যবস্থায় কোন জমি নিরন্তর কিংবা চিরস্থায়ী হিসেবে চাষাবাদে ব্যবহৃত হয় না। বরং, একবার চাষ হবার পর কিছুকাল তা অনাবাদী বা পতিত জমি হিসেবে ফেলে রাখা হবে। নৃবিজ্ঞানীরা এই বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন। ফলে উদ্যান-কৃষির আরেকটি নাম হচ্ছে বিস্তৃত কৃষি বা extensive agriculture। সেক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক সমাজের নামকরণ করা হয় নিবিড় কৃষি বা intensive agriculture। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরেকটি পার্থক্য জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের খাদ্য উৎপাদন সমাজগুলোতে চাষাবাদের জন্য নিড়ানি এবং খোদন কাঠির মত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কৃষিভিত্তিক সমাজে উৎপাদনের জন্য গৃহপালিত গবাদিপশু, সেচ কিংবা লাঙ্গলের উপর যে নির্ভরশীলতা তার থেকে এই সমাজ একেবারেই ভিন্ন।

সাধারণভাবে নিবিড় কৃষির তুলনায় এই ব্যবস্থায় জমি প্রতি ফসলের পরিমাণ কম হয়ে থাকে। কিন্তু এ সকল সমাজের সদস্যদের খেয়ে পরে বাঁচার মত যথেষ্ট পরিমাণ খাবার তাঁরা উৎপাদন করেন বলে নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য। তাঁরা নিজেদের খেয়ে বাঁচার মত পরিমাণ খাদ্যই সাধারণত উৎপাদন করেন, বাজারে বিক্রি করার মত বাড়তি উৎপাদন করেন না। ধারণা করা হয় যে, এ ধরনের সমাজে বর্গ মাইল প্রতি ১৫০ জনের মত মানুষজন থাকেন। তবে নিউ গিনিতে মিষ্টি আলুর উৎপাদন দিয়ে বর্গ মাইল প্রতি প্রায় ৫০০ লোকের খাদ্য সরবরাহ হয়ে থাকে। শুকনো এলাকায় এরকম সমাজের নজির পাওয়া গেছে, যেমন: উত্তরপূর্ব আরিজোনার **হোপি ইন্ডিয়ান**। তবে গ্রীষ্মীয় বনভূমি অঞ্চলে এরকম সমাজ আরও বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন: **দক্ষিণপূর্ব এশিয়া**, **সাব-সাহারা আফ্রিকা**, কিছু **প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ** এবং

দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের **আমাজন বেসিন**। উদ্যান-কৃষিতে চাষের একটা ধরন হচ্ছে সুইডেন (swidden) বা স্ল্যাশ এন্ড বার্ন (slash and burn) পদ্ধতি। কোন একটা ভূমিখন্ডের গাছ কেটে পরিষ্কার করে ফেলা হয় এবং সেখানকার ঝোপঝাড়ে আগুন দেয়া হয়। পোড়া গাছগুলি জমিতে ফেলে রাখা হয় যাতে রোদে জমি শুকিয়ে না যায়। এই ছাই সার হিসেবে কাজ করে এবং জমিতে প্রাণসঞ্চার করে। এর পরে এখানে চাষ করা হয়। কোন জমিতে কয়েক বছর চাষাবাদ করার পর আবার কয়েক বছর এইভাবে ফেলে রাখা হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় **জুমচাষ** নামে যে চাষাবাদ প্রচলিত তাকেও এই ধরনের পদ্ধতি বলা হয়। একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার। তা হচ্ছে: এই ব্যবস্থায় মানুষের শ্রম খুবই অল্প ব্যবহৃত হয়। উদ্যান-কৃষি ব্যবস্থা ক্রমাগত কমে আসছে দুনিয়া ব্যাপী কৃষির বিস্তারের চাপে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পলিসি এবং ভূমির মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবহার জুমচাষকে বিলোপ করছে।

নিবিড় কৃষি সমাজ (agriculturist societies) এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বদল

কৃষিভিত্তিক সমাজকে অনেক সময়ে নিবিড় কৃষির সমাজও বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের সমাজে কৃষিজ প্রযুক্তি উদ্যান-কৃষির থেকে ভিন্ন। প্রধান পার্থক্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিবিড় কৃষিতে সেচ, লাঙ্গল ব্যবহার করা হয় এবং চাষও হয় নিয়মিতভাবে যা উদ্যান-কৃষিতে হয় না। এছাড়া আরেকটা বিরাট পার্থক্য হচ্ছে মানুষের প্রদত্ত শ্রমের ক্ষেত্রে। নিবিড় কৃষিতে মানুষের অনেক শ্রম দিতে হয়। এটা ঠিক যে, প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসেবে অনেক সমাজেই কৃষির প্রচলন থাকতে পারে। কিন্তু, বর্তমান পৃথিবীর পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে কৃষিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হিসেবে দেখা যেতে পারে। নৃবিজ্ঞানীরা অবশ্য এই প্রশ্নকে সামনে রেখে বিস্তর তর্ক করেছেন। তা হ'ল: কৃষির সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক কি? অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেছেন যে কৃষিভিত্তিক আর্থব্যবস্থা একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা; যেমন, ফার্থ, বেইলী, পোল্যানয়ি প্রমুখ। এ ব্যাপারে আপনারা কৃষক আর্থব্যবস্থা পাঠে আলোচনা পাবেন। ফলে এখানে এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে না।

নৃবিজ্ঞানীরা অবশ্য এই প্রশ্নকে সামনে রেখে বিস্তর তর্ক করেছেন। তা হ'ল: কৃষির সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক কি? অনেক নৃবিজ্ঞানীই মনে করেছেন যে কৃষিভিত্তিক আর্থব্যবস্থা একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, বর্তমান দুনিয়া হচ্ছে প্রযুক্তির দুনিয়া এবং প্রযুক্তি যত অর্জিত হয় ততই মানুষের শ্রমের গুরুত্ব এবং প্রয়োজন কমে। শ্রমিকদের জীবনে এই কথাটার তেমন কোন অর্থ নেই বিশেষত বর্তমান দুনিয়ার কৃষিজ শ্রমিক যাঁরা তাঁদের জীবনে। মার্শাল সাহলিনস এবং অন্যান্য নৃবিজ্ঞানীদের কাজ থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের শ্রমের প্রয়োজন পড়ে কম। তাছাড়া তাঁরা এও বলেছেন যে, এ ধরনের সমাজে পরিপূর্ণতা ছিল কিংবা আছে। বর্তমান দুনিয়ার কৃষিতে নিয়োজিত মানুষজনের ফসল ফলাবার জন্য অনেক বেশি শ্রম দিতে হয়। যেহেতু নিবিড় কৃষিতে ফসল ফলে গড়ে বেশি তাই এই শ্রম দেবার একটা অর্থ রয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কৃষিক্ষেত্রে শ্রম দিচ্ছেন যে সকল কৃষক-কিষাণী তাঁরা এই সকল উৎপাদিত ফসলের কতটুকু হিস্যা পান। কিংবা উৎপাদন ব্যবস্থায় বদল আসাতে তাঁদের জীবনের মৌলিক বদল কি ঘটেছে। এই কথা বিশেষত গরিব বিশ্বের কৃষকদের বেলায় আরও খাটে। বর্তমান দুনিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের সকলেরই খেয়াল রাখা দরকার। যদিও কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা হয়ে থাকে অপরাপর উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে এতে অন্নসংস্থান হয় বেশি, কিন্তু লাভজনক ফসল ফলিয়ে মুনাফা অর্জনই বর্তমান কৃষিব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুনাফা অর্জনের এই হিসাব নিকাশ কৃষকের হাতে থাকে না। বরং বৃহত্তর ব্যবস্থার মধ্যে মুনাফার ব্যাপারটা জড়িত থাকে। তাছাড়া, শিল্পভিত্তিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখবার জন্য কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এখানে কাঁচামালের যোগান দিয়ে থাকে। এভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষজনের শ্রম মজুরি শ্রমে পরিণত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের সকল শ্রম কিনে নেবার ব্যবস্থা থাকে। সেটা প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে সম্ভব নয়। এই কারণেই প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদী সমাজের শ্রম ও শ্রমিককে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বোঝা প্রয়োজন। শ্রমের সাথে উৎপাদনের সম্পর্ক নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ভেবেছেন মার্ক্সবাদী

যদিও কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা হয়ে থাকে অপরাপর উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে এতে অন্নসংস্থান হয় বেশি, কিন্তু লাভজনক ফসল ফলিয়ে মুনাফা অর্জনই বর্তমান কৃষিব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাত্ত্বিকেরা। নৃবিজ্ঞানেও তাঁদের একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সমাজের উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করবার জন্য উৎপাদন পদ্ধতি (mode of production) বলে একটা ধারণা তাঁরা প্রয়োগ করেন। উৎপাদন পদ্ধতি বলতে কোন সমাজের প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বস্তুগত আয়োজন যেমন বোঝায়, তেমনি একই সাথে তা উৎপাদনকারী এবং ভোগকারীদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কও বোঝায়।

সারাংশ

বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে গবেষণা করেছেন নৃবিজ্ঞানীরা। উৎপাদনের ধরন দেখতে গিয়ে সাধারণভাবে খাদ্য সংগ্রহের উপায়ের উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের অনেকের চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে: পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সবচেয়ে স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য। এভাবেই পৃথিবীর সকল উৎপাদন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন তাঁরা: প্রাক্-পুঁজিবাদী এবং পুঁজিবাদী। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া, পরিবেশ এবং প্রযুক্তির কলা কৌশল ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদনের ধরন সৃষ্টি করেছে বলে কিছু নৃবিজ্ঞানী মনে করেছেন। সেই ভিত্তিতে ৪ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়েছে: শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ, পশুপালক সমাজ, উদ্যান-কৃষি সমাজ এবং নিবিড় কৃষি সমাজ। তবে সেক্ষেত্রেও 'প্রাক্-পুঁজিবাদী' লেবেল দেয়া হয়েছে সেই সমাজগুলোকে। তবে অনেক নৃবিজ্ঞানীরই অভিমত হচ্ছে, বর্তমান দুনিয়ার কৃষি ব্যবস্থা পুঁজিবাদ এবং শিল্পভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। নৃবিজ্ঞানী মার্শাল সাহলিন্‌স কোন ধরনের সমাজকে সত্যিকার সমৃদ্ধ সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন?

ক. পশুপালক সমাজ
খ. উদ্যান-কৃষি সমাজ
গ. শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজ
ঘ. নিবিড় কৃষি সমাজ

২। মাসাই জাতি আফ্রিকার কোন অংশে বাস করে?

ক. পূর্ব আফ্রিকা
খ. পশ্চিম আফ্রিকা
গ. উত্তর আফ্রিকা
ঘ. দক্ষিন আফ্রিকা

৩। পশ্চিম ইরানের দক্ষিন জাগরোস পর্বতমালার বাখতিয়ার জাতি কোন সমাজের সাথে সম্পর্কিত?

ক. উদ্যান-কৃষি সমাজ
খ. পশুপালক সমাজ
গ. নিবিড় কৃষি সমাজ
ঘ. শিকার-সংগ্রহকারী সমাজ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজ বলতে কী বোঝায়?

২। শিকারী-সংগ্রহকারী সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উদ্যান-কৃষি এবং পশুপালন আর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।

২। প্রাক্-পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদী আর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের গুরুত্ব ব্যাপক। এই বক্তব্যের সাথে কী আপনি একমত? আপনার বক্তব্য তুলে ধরেন।

পাঠ - ৩

বিনিময় এবং বণ্টন
Exchange and Distribution

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থা পরস্পর সম্পর্কিত
- নৃবিজ্ঞানীরা তিন ধরনের বিনিময় প্রথা শনাক্ত করেছেন
- আধুনিক কালে মুদ্রাভিত্তিক বাজার বিনিময় ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী মুনাফার প্রক্রিয়া চালু করেছে

অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানে বিনিময় এবং বণ্টন খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। আবার বিনিময় এবং বণ্টনকে পরস্পর সম্পর্কিত মনে করা হয়। এর পেছনে একটা কারণ অনুমান করা যায়। আপনারা আগেই জানেন নৃবিজ্ঞানীরা প্রধানত ইউরোপ থেকে অন্যান্য সমাজ দেখতে গিয়েছিলেন। ইউরোপের সমাজে তখন বাজার ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী। সমাজে উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিনিময় হবে বাজারে – এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়েছে তাঁদের কাছে। কিন্তু ইউরোপের বাইরে অন্যান্য সমাজে গিয়ে এই ধারণাটা একেবারেই পাল্টে গেছে তাঁদের জন্য। সকল সমাজে সেরকম বাজার ছিল না। ফলে কিভাবে ঐ বিশেষ সমাজের মানুষজন উৎপাদিত দ্রব্যাদি আদান-প্রদান করে থাকে সেই জিজ্ঞাসাটা বড় হয়ে দেখা দিল। আবার, আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে বিনিময় এবং বণ্টন ধারণা দুটো অর্থশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু প্রচলিত অর্থশাস্ত্র এই সকল সমাজ নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখায়নি যে সকল সমাজে নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের সূত্রপাত নিয়ে আলোচনায় তা আপনারা দেখেছেন।

পুঁজিবাদী সমাজে সকল বিনিময় হয়ে থাকে বাজারে এবং বিনিময় করবার জন্য শ্রমিকের কেবল নিজের শ্রম থাকে।

এখানে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার করা দরকার যা নিয়ে তালগোল বেধে যেতে পারে। বিনিময় এবং বণ্টনকে একত্রে ভাবা হয় কেন? একটু চিন্তা করলেই এ দুয়ের সম্পর্কটা বোঝা যাবে। সমাজে যা কিছু উৎপাদিত হয় তা ঐ সমাজের মানুষজনের কাছে আপনা-আপনি পৌঁছে যায় না। যে প্রক্রিয়ায় সেইসব দ্রব্যাদি মানুষজনের কাছে যায় তার নাম বণ্টন। আবার সবাই সব কিছু উৎপাদন করেন না। যিনি একটা বিশেষ জিনিস উৎপাদন করেন তাঁর জীবন যাপনের জন্য কেবল ঐ বিশেষ জিনিসের উপর নির্ভর করলে চলে না। অন্যান্য জিনিসও দরকার পড়ে। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর উৎপাদিত দ্রব্যাদি অন্যের সঙ্গে বদল করতে পারেন। এভাবে এটা বিনিময় করা হচ্ছে। সুতরাং, বণ্টনের সঙ্গে বিনিময়ের সম্পর্ক রয়েছে। তবে এগুলো হচ্ছে আদর্শ অবস্থার কথা। বাস্তবে অগ্রসর পুঁজিবাদী সমাজে দেখা যায় বহু সংখ্যক মানুষ উৎপাদনের জন্য খাটাখাটুনি করেন কিন্তু বিনিময় করবার জন্য তেমন কিছুই হাতে থাকে না। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের এই অবস্থাকে বিবেচনায় রাখা দরকার। পুঁজিবাদী সমাজে সকল বিনিময় হয়ে থাকে বাজারে এবং বিনিময় করবার জন্য শ্রমিকের কেবল নিজের শ্রম থাকে। সেই শ্রম বিক্রি করে তিনি মজুরি পান। সে কারণে পুঁজিবাদী সমাজে এই শ্রমের বাজারকে শ্রমবাজার বলা হয়। আবার পুঁজিবাদী সমাজেই এমন অনেক মানুষ এবং সামাজিক গোষ্ঠী আছেন যাঁরা তেমন কোন উৎপাদন করেন না কিন্তু বিনিময় করবার জন্য অনেক টাকা হাতে থাকে তাঁদের। মুদ্রাব্যবস্থায় এটা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক বাজার ব্যবস্থায় এটা সম্ভব যে টাকার বিনিময়ে সকল কিছু কেনা যায়। এভাবে বিনিময় এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাট এক অসমতা আমরা লক্ষ্য করি।

১৯৬৮ সালে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানী কার্ল পোল্যানয়ি বিভিন্ন সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিন ধরনের বণ্টনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে : পারস্পরিক লেনদেন (reciprocity), পুনর্বণ্টন (redistribution) এবং বাজার বিনিময় (market exchange)। কেউ কেউ এগুলোকে বণ্টনের ধরন

কার্ল পোল্যানয়ি বিভিন্ন সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিন ধরনের বন্টনের কথা উল্লেখ করেছেন... পারস্পরিক লেনদেন, পুনর্বন্টন এবং বাজার বিনিময়।

না বলে বিনিময়ের ধরন হিসেবে দেখে থাকেন। এই তিন ধরনের বণ্টনের মধ্যে প্রথম দুটিতে মুদ্রার তেমন কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু তৃতীয়টিতে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাপক। বলা চলে যে মুদ্রা ছাড়া বাজার ব্যবস্থা অচল। ইউরোপীয় সমাজে গত কয়েক 'শ বছর এই ধরনের বণ্টন বা বিনিময় ব্যবস্থা চালু আছে। মুদ্রার সবচেয়ে বড় সামর্থ্য হচ্ছে তা দিয়ে মানুষের শ্রম কেনা যায়। মুদ্রা থাকলে মানে টাকা জমানো থাকলে তার নিজেরই একটা শক্তি থাকে। সেই টাকার পরিমাণ বিনিময় করলে কতটা সম্পদ পাওয়া যাবে সেটারও হিসেব থাকে। অন্য কোন সমাজে ঠিক এইভাবে কোন শক্তি জমিয়ে রাখা যায় না। এরকম নির্বিচারে শ্রমও কেনা যায় না। বাজার ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় এখানে মানুষজনকে ঠকাবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। এর মানে হ'ল: অন্যান্য পদ্ধতির বিনিময়ে দুই বা ততোধিক পক্ষের কারো ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। সেটাই ঐ পদ্ধতিগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য। কারো কারো মতে বাজার ব্যবস্থার ভিত্তিই হচ্ছে কোন না কোন পক্ষকে ঠকানো বা শোষণ। ইদানিং কালের নৃবিজ্ঞানে বাজার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

পারস্পরিক লেনদেন (reciprocity)

যখন দুই পক্ষের মধ্যে দ্রব্যাদি (goods) বা পরিষেবার (services) প্রায় সমমূল্যের বিনিময় হয় তখন তাকে পারস্পরিক লেনদেন বলা হয়।

যখন দুই পক্ষের মধ্যে দ্রব্যাদি (goods) বা পরিষেবার (services) প্রায় সমমূল্যের বিনিময় হয় তখন তাকে পারস্পরিক লেনদেন বলা হয়। উপহার বিনিময়কেও এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। এখানে সমমূল্য কথাটি নিয়ে একটু ভাববার দরকার আছে। আমাদের মাথায় মুদ্রার প্রচলন এত শক্তিশালীভাবে গেঁথে আছে যে 'সমমূল্য' বললেই আমরা মুদ্রার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে বসি – 'দাম কত'। যে সকল সমাজে মুদ্রার একই রকম দাপট ছিল না সেখানে সমমূল্যের বলতে প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা দিয়ে বুঝতে হবে। এই ধরনের বিনিময় বা বণ্টন পদ্ধতিতে মুনাফা বা লাভের প্রসঙ্গ আসে না – সেটা আপনারা আগেই জেনেছেন। এখানে সামাজিক মান-মর্যাদার বিষয় কেন্দ্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা। অর্থাৎ, যে জিনিসটা বিনিময় করা হচ্ছে তার ব্যবহারিক গুরুত্ব কি।

কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক লেনদেনের ৩টি ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে: সাধারণীকৃত লেনদেন (generalized reciprocity), ভারসাম্যকৃত লেনদেন (balanced reciprocity) এবং নেতিবাচক লেনদেন (negative reciprocity)। সাধারণীকৃত লেনদেনের সবচেয়ে কার্যকরী উদাহরণ হচ্ছে খাবার-দাবার ভাগ করা যেখানে নিজের কোন ধরনের স্বার্থ কাজ করে না। এটা এমন একটা লেনদেন **যেখানে প্রদত্ত জিনিসের মূল্য হিসেব করা হয় না, ফিরতি পাওনার জন্য কোন সময়কাল নির্দিষ্ট করা থাকে না।** অস্ট্রেলীয় শিকারী সম্প্রদায় যখন কোন জন্তু হত্যা করে তখন শিকারীদের পরিবারে এবং অন্যান্য পরিবারে মাংস ভাগাভাগি করে নেয়া হয়। একটা দলের সকলেই এর ভাগ পায়। কে কতটা এবং কি পাবে তা নির্ভর করে শিকারীর সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্কের উপর। যেমন, একটা ক্যাঙ্গারু হত্যা করা হলে এর পেছনের বাম পা ভাইয়ের পরিবারে যাবে, লেজ যাবে চাচাত ভাইয়ের কাছে, পাছার মাংস এবং চর্বি যাবে শ্বশুরের কাছে, শাশুড়ির কাছে যাবে পাঁজর, সামনের পা দুটো ফুপুর কাছে, মাথা যাবে শিকারীর স্ত্রীর কাছে এবং নাড়িভুঁড়ি ও রক্ত শিকারীর নিজের কাছে থাকবে। যে সকল নৃবিজ্ঞানী অস্ট্রেলীয় এই সমাজ পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী এই হচ্ছে সেই সমাজের নিয়ম। বণ্টনের এই সামাজিক নিয়ম মানা না হলে সেখানে এ নিয়ে তর্ক-বিবাদ হতে পারে। এই ব্যবস্থায় শিকারী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত মনে হতে পারে, কিন্তু অন্য একজন শিকার করলে তারা আবার সুবিধাজনক ভাগ পাবে। দেয়া ও নেয়ার বেলায় এই রেওয়াজ হচ্ছে বাধ্যতামূলক। যেমনটা কুরবানীর মাংসের বেলায় এই অঞ্চলে হয়ে থাকে। অনেকে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ককে সাধারণীকৃত লেনদেনের সম্পর্ক হিসেবে বলে থাকেন।

ভারসাম্যকৃত লেনদেন বলতে বোঝানো হয়ে থাকে **যেখানে কোন দেয়া-নেয়া মূল্যের হিসেবে এবং ফেরতের সময়কালে নির্দিষ্ট করা থাকে।** নৃবিজ্ঞানী রবার্ট লোঈ **ক্রো ইন্ডিয়ান** সমাজ থেকে এরকম বিনিময়ের উদাহরণ টেনেছেন। ধরা যাক কোন বিবাহিত নারী তাঁর ভাইকে খাবার উপহার দিলেন, তাঁর

ভাই তখন মহিলার স্বামীকে ১০টা তীর দিতে পারেন যাকে একটা ঘোড়ার সমতুল্য মনে করা হয় ঐ সমাজে। এই ধরনের লেনদেনের সবচেয়ে খ্যাতিমান উদাহরণ হচ্ছে মালিনোস্কি বর্ণিত নিউ গিনির ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের কুলা চক্র। তবে এটাকেই কেউ কেউ আবার প্রাথমিক পর্যায়ের বার্টার (আধুনিক মুদ্রার বদলে অন্য কোন দ্রব্যকে বিনিময়ের মান হিসেবে ব্যবহার) ভিত্তিক বাণিজ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। কুলা চক্র বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। **যখন কোন বিনিময়কারী গ্রহীতা হিসেবে বাড়তি সুবিধা পাবার চেষ্টা করে থাকে তখন নেতিবাচক লেনদেন বলা হয়**। এক্ষেত্রে লেনদেনের দুই পক্ষের মধ্যে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ কাজ করে। কোন কিছু জোর করে নিয়ে নেয়াকে এ ধরনের লেনদেনের গুরুতর উদাহরণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানী ক্লাকহন **নাভাজো** সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন যেখানে কোন ভিনদেশী মানুষের সাথে দেনাপাওনার সময় তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা নৈতিকভাবে সমর্থন করা হয়ে থাকে। ভারসাম্যকৃত লেনদেনের একটা ধরন হিসেবে **সমতা বিধানের কৌশল** (levelling mechanism) উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এটার মূলনীতি হচ্ছে কোন সমাজে বিশেষ কারো হাতে সম্পদ জমতে না দেয়া। এখানে একটা ব্যাপার ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এ ধরনের লেনদেন নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই ব্যাপক অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন, পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে বলা হয় এটা স্বার্থের ঊর্ধ্বে সমতুল দ্রব্যাদির বিনিময়, আবার নেতিবাচক লেনদেনের উদাহরণ হিসেবে লুণ্ঠন বা চুরিকে উল্লেখ করা হয়। এই অসঙ্গতিগুলোর একটা কারণ হতে পারে; যে সকল সমাজ নৃবিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ করেছেন তার অধিকাংশই দুর্বোধ্য লেগেছে তাঁদের কাছে। কারণ পশ্চিমা সমাজ থেকে এই সমাজগুলো সবিশেষ ভিন্ন।

কুলা চক্র: ভারসাম্যকৃত লেনদেনের সাধারণ উদাহরণ হিসেবে উপহার বিনিময়ের কথা সবসময়ই উল্লেখ করা হয়। নৃবিজ্ঞানের গবেষণার ইতিহাসে কুলা চক্রের কথা এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে বলা হয়ে থাকে। ম্যালিনোস্কি নিউ গিনির ট্রব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত এই প্রথা বর্ণনা করেছেন। একে বাণিজ্য হিসেবেও দেখা হয়। কুলা হচ্ছে বৃত্তাকারে সজ্জিত কতগুলো দ্বীপে বসবাসরত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াশীল ব্যাপক একটি লেনদেন। এই লেনদেনে দুই ধরনের বস্তু প্রধান, এগুলো দুইটা ভিন্ন ভিন্ন গতিপথে ভ্রমণ। লাল শামুক দিয়ে বানানো বড় কণ্ঠহার (*soulava*) যা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে এবং সাদা শামুকে বানানো বাজুবন্দ (*mwali*) যা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে কোন একটি বস্তু অন্যটার বিনিময়ে বিনিমিত হয়। এই লেনদেনের অপরাপর খুঁটিনাটি নির্ধারিত হয় সমাজের প্রথা ও কানুন দ্বারা। অংশীদার প্রত্যেকটা গ্রামের কিছু পুরুষ কুলা চক্রে অংশ নিয়ে থাকে। এরা এই প্রথার শরিকদের কাছ থেকে বাজুবন্দ কিংবা কণ্ঠহার গ্রহণ করে এবং কিছুক্ষণ নিজের কাছে রেখে অন্য কারো কাছে চালান দেয়। কেউই কোন বস্তু চিরতরে দখল করে না। এই আদান-প্রদান সম্পর্ক সেখানে চিরস্থায়ী, জীবনব্যাপী সম্পর্ক।

কুলা বিনিময়কে সমাজ সংহতির একটা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। লেনদেনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অংশীদারবৃন্দ সামাজিকভাবে একে অপরের আপন থাকে। কুলার মূল দ্রব্যাদির পাশাপাশি অন্যান্য দ্রব্যাদিও বিনিময় হয়ে থাকে। সেই বাণিজ্যের একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে এই প্রথায়।

ম্যালিনোস্কির মতে, কুলা বিনিময়ের সন্তুষ্টি জড়িয়ে আছে তাদের মর্যাদা আর অনুভূতিকে ঘিরে। তবে কুলা বিনিময়কে সমাজ সংহতির একটা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। লেনদেনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অংশীদারবৃন্দ সামাজিকভাবে একে অপরের আপন থাকে। কুলার মূল দ্রব্যাদির পাশাপাশি অন্যান্য দ্রব্যাদিও বিনিময় হয়ে থাকে। সেই বাণিজ্যের একটা স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে এই প্রথায়। কিন্তু সর্বোপরি, কুলা প্রথার গুরুত্ব হচ্ছে একটা সমাজের মানুষজনের মধ্যকার সৌহার্দ্য। নৃবিজ্ঞানীদের সেরকমই অভিমত।

চিত্র - ১ : কুলা চক্র

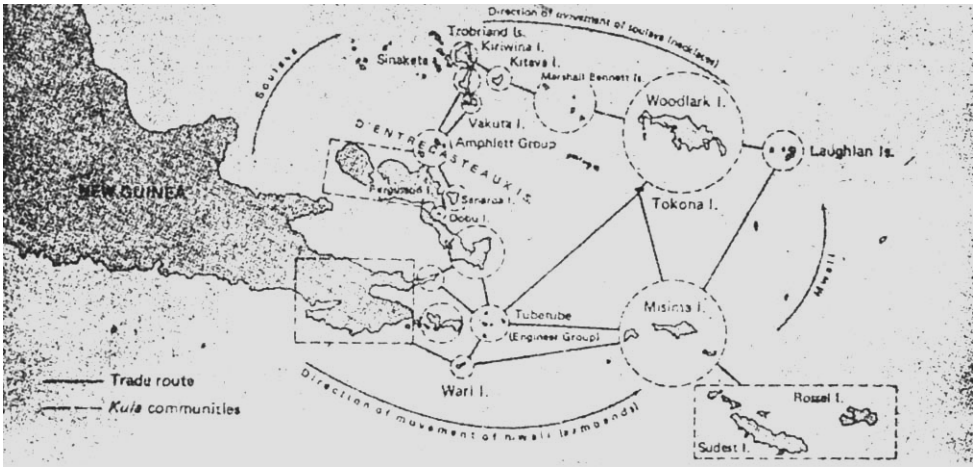

সূত্রঃ সেরেনা নন্দা, *কালচারাল এ্যান্থ্রোপলজি* [৩য় সংস্করণ]

পুনর্বণ্টন (redistribution)

যখন দ্রব্যাদি কোন একটা কেন্দ্রীয় জায়গায় প্রথমে জড়ো করা হয় এবং পরে আবার বণ্টন করা হয় তাকে পুনর্বণ্টন বলে।

যখন দ্রব্যাদি কোন একটা কেন্দ্রীয় জায়গায় প্রথমে জড়ো করা হয় এবং পরে আবার বণ্টন করা হয় তাকে পুনর্বণ্টন বলে। এভাবে পুনর্বণ্টন একটা "সামাজিক কেন্দ্র" ঘিরে গড়ে ওঠে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে, যে সকল সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে চীফ (chief) বা বিগমেন (bigmen) থাকে সেখানে এ ধরনের বণ্টন রীতি প্রচলিত। প্রধান বা রাজা কয়েকটা পদ্ধতিতে সম্পদ জড়ো করে থাকেন। যেমনঃ উপহার হিসেবে, কর বা খাজনা হিসেবে, যুদ্ধক্ষেত্রের অবশিষ্ট হিসেবে ইত্যাদি। এই সম্পদই আবার পুনর্বণ্টন করা হয়ে থাকে। পুনরায় বণ্টন করার প্রক্রিয়া নানান ভাবে হতে পারে। কখনো কখনো দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। কখনো আবার ভোজসভার আকারে এই সম্পদ পুনর্বণ্টিত হয়। সম্পদ পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রধান বা রাজার কয়েকটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে। প্রথমত, সম্পদ বিতরণের এই ভূমিকায় গিয়ে সমাজে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত রাখা। এখানে দান-ধ্যান মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রতি সমর্থন আছে এমন মানুষের জন্য ন্যূনতম একটা জীবন যাপন মান নিশ্চিত করা। তৃতীয়ত, নিজ এলাকার বাইরে মৈত্রী স্থাপন করা। নিউ গিনির উদ্যান-কৃষিভিত্তিক সমাজে অতিথিদের শূকরের মাংস দিয়ে ভোজ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। কর সংগ্রহ এবং তারপর এর ব্যবহার পুনর্বণ্টনের একটা নমুনা। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে পেরুর **ইংকা** সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়। অনেকের মতে আধুনিক রাষ্ট্রের কর বা খাজনা সংগহকেও এ ধরনের বণ্টন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে দেখা যায়। পুনর্বণ্টনের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত উদাহরণ হচ্ছে **কোয়াকিউট্‌ল** সমাজের পটল্যাচ প্রথা।

পটল্যাচ: উত্তর আমেরিকার উত্তরপশ্চিম উপকূলে **কোয়াকিউট্‌ল ইন্ডিয়ান**দের মধ্যে পটল্যাচ প্রথার কথা উল্লেখ করেছেন কিছু নৃবিজ্ঞানী। এই প্রথাকে পুনর্বণ্টন ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কোয়াকিউট্‌ল ছাড়া অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই প্রথার কাছাকাছি কিছু ব্যাপার জানা গেছে। কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে পটল্যাচ হচ্ছে বহুল চর্চিত গণ-উৎসব। সাধারণভাবে পটল্যাচ হচ্ছে একটা ভোজসভা যেখানে খাওয়ানো ছাড়াও মেজবান (যিনি দাওয়াত দিয়ে থাকেন) অতিথিদেরকে নানান ধরনের উপহার দিয়ে থাকেন। নৃবিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেছেন যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের আয়োজনে দাওয়াত দিয়ে থাকেন চীফ বা প্রধানেরা। তাঁর অতিথিরা একই গ্রাম বা এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারা এবং অন্যান্য গ্রাম বা এলাকার প্রধানেরা। সকলকেই তিনি উপহার দিয়ে থাকেন। নৃবিজ্ঞানীরা এও উল্লেখ করেছেন, অতিথিরা তাঁদের নিজ নিজ সামাজিক মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপহার পেতেন। এখানে একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। তা হ'ল: কোয়াকিউট্‌ল সমাজে টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পত্তি মর্যাদার ভিত্তি নয়। বরং, পটল্যাচ উৎসব আয়োজন করাই হয় কোন একজনের ধন-সম্পদ কমাবার স্বার্থে। অর্থাৎ, যাতে তাঁর ধন-সম্পদ বেশি জমে না থাকে সেই উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে এ ধরনের আয়োজন হ'ত।

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে কিংবা সাবালকত্ব লাভ – ইত্যাদি উপলক্ষ্যে পটল্যাচ উৎসব হ'ত। উৎসব স্থানে খাওয়ানো ছাড়াও খাবার বিলি করা হ'ত। অতিথিদের যে সকল উপহার দেয়া হ'ত তার মধ্যে রয়েছে কম্বল, কাঠের বাক্স, নৌকা, মাছের তেল, ছাতু ইত্যাদি। বিপুল পরিমাণ সম্পদ খরচ করাই এই উৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য। এখানে মেজবানের মহত্ব কিংবা ইজ্জতও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর এই আতিথেয়তার কারণে সম্মান লাভ করেন। কিন্তু মূল চেতনাটি আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। তা হচ্ছে, কোনমতেই সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা সেই সমাজে কাম্য নয়। এই উৎসব নিয়ে অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানীদের আগ্রহের কারণ বুঝতেই পারছেন। সমাজের সম্পদের বণ্টন করবার জন্য এই উৎসব বিশাল ভূমিকা রাখে।

বাজার বিনিময় (market exchange)

ব্যবস্থায় যাবতীয় দ্রব্যাদি এবং পরিষেবা টাকার বিনিময়ে কেনাবেচা হয়। এক্ষেত্রে দাম মোটামুটি আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে।

এই ব্যবস্থায় যাবতীয় দ্রব্যাদি এবং পরিষেবা টাকার বিনিময়ে কেনাবেচা হয়। এক্ষেত্রে দাম মোটামুটি আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে। আগে থেকে নির্ধারিত থাকার যুক্তি হিসেবে অর্থনীতিবিদগণ চাহিদা ও যোগানের সূত্র উল্লেখ করে থাকেন। পুঁজিবাদী সমাজে এই ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ। নৃবিজ্ঞানের শুরুর লগ্নে, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত, কেবল ইউরোপের এবং উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সমাজে বাজার ব্যবস্থার বিনিময় চালু ছিল। নৃবিজ্ঞানীরা এই ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক হিসেবে দেখে থাকেন। তাঁদের ভাবনা এবং অভিজ্ঞতায় এই ব্যবস্থার প্রভাব এতটাই শক্তিশালী ছিল যে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজে প্রচলিত বিনিময় ব্যবস্থাকে তাঁরা প্রাচীন এবং রূপান্তরশীল মনে করেছেন। কেউ কেউ বাজার ব্যবস্থাকেই একমাত্র "খাঁটি অর্থনৈতিক" বিনিময় প্রথা বলেছেন।

বাজার ব্যবস্থায় টাকা বা মুদ্রার গুরুত্বের কথা আগেই আপনারা জেনেছেন। নৃবিজ্ঞানীরা বাজার ব্যবস্থায় ব্যবহৃত মুদ্রাকে **সর্ব-কার্যের মুদ্রা** (all-purpose money) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর কারণ হ'ল বাজার বিনিময় ব্যবস্থায় সকল কিছুর (সকল দ্রব্য এবং মানুষের সকল প্রকার দক্ষতা, যোগ্যতা) মুদ্রামানে দাম ঠিক করা আছে। মুদ্রা দিয়ে সকল কিছু খরিদ করা যায়। মানুষের শ্রমও। কেবল তাই নয়, সমাজে যে গোষ্ঠীর হাতে মুদ্রা থাকে তারাই শ্রমের দাম নির্ধারণ করতে পারে। অন্যান্য সমাজে বিনিময়ের জন্য কখনো কখনো কোন একটা বস্তুকে মুদ্রার মত করে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই কেবল চলে। বাজারভিত্তিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান থাকে। কোন একটি অঞ্চলের সর্বত্র মুদ্রার মান এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার কাজ এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে। সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক এই কাজ করে থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই কাজ সহজ নয়। সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছাড়া বাজার ব্যবস্থা

নিশ্চিতভাবে কায়েম করা সম্ভব নয়। এখানে আরো কিছু বিষয় খোলাসা করা দরকার। বর্তমান দুনিয়ার বাজার ব্যবস্থায় কোন একটি দেশ বিচ্ছিন্ন নয়, থাকতে পারে না। গরিব ও ধনী বিশ্ব পরস্পর নানাভাবে সম্পর্কযুক্ত। এবং, এই সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরিব বিশ্ব আরো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হবে পরবর্তী পাঠের আলোচনায়।

সারাংশ

অনেক নৃবিজ্ঞানীর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত ভাবনা এসেছে অর্থশাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ, ধারণা কিংবা তত্ত্ব থেকে। উৎপাদনের পাশাপাশি বণ্টন এবং বিনিময়কেও ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। বণ্টন এবং বিনিময় উভয়ক্ষেত্রেই মূল বিবেচ্য হচ্ছে কিভাবে মানুষজন উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা পেতে পারেন। এই দুই-কে একত্রে আলোচনা করা হয়ে থাকে। নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেছেন, পুঁজিবাদী নয় এমন সমাজের মানুষজনের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বৈষম্য কম। বণ্টন এবং বিনিময়ের তিনটা ধরনকে চিহ্নিত করেছেন তাঁরা: পারস্পরিক লেনদেন, পুনর্বণ্টন এবং বাজার। এর মধ্যে শেষেরটা পরিপূর্ণভাবে পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য। তবে অন্য অনেক নৃবিজ্ঞানী মনে করেছেন, যদি বিনিময় এবং বণ্টন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হয় তাহলে অবশ্যই মনোযোগ দেয়া দরকার গরিব এবং ধনী দেশগুলোর সম্পর্কের দিকে এবং গরিব এবং ধনী শ্রেণীর সম্পর্কের দিকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। পারস্পরিক লেনদেনের কয়টি ধরন চিহ্নিত করা হয়?

ক. ২টি　　খ. ৩টি
গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

২। "সমতা বিধানের কৌশল" - ধরনটি কোন প্রকার লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত?

ক. সাধারনীকৃত লেনদেন　　খ. ভারসাম্যকৃত লেনদেন
গ. নেতিবাচক লেনদেন　　ঘ. উপরের সবগুলোই

৩। কোন উপজাতি সমাজে পটল্যাচ প্রথা দেখা যায়?

ক. ইংকা　　খ. কারিমোজোং
গ. কোয়াকিউটল ইন্ডিয়ান　　ঘ. নান্দী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। বণ্টন ব্যবস্থা কীভাবে বিনিময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত?

২। বিনিময় এবং বণ্টন-এর ধরনসমূহ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কোন কোন সমাজে উৎসবের মধ্য দিয়ে আর্থনীতিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে তা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করুন।

২। 'বর্তমান কালে বিনিময় ব্যবস্থার মুখ্য নির্ধারক হচ্ছে বাজার' – ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ৪

কৃষক আর্থব্যবস্থা
Peasant Economy

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- কৃষক আর্থব্যবস্থাকে অনেক নৃবিজ্ঞানীই স্বতন্ত্র হিসেবে দেখেছেন
- বর্তমান পৃথিবীতে কৃষকদের মধ্যে নানা প্রকার ভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড খেয়াল করা যায়
- বাজার ব্যবস্থার মধ্যে কৃষকদের জীবন ধারণের সংগ্রাম

নৃবিজ্ঞানে দীর্ঘকাল ধরে কৃষক আর্থব্যবস্থা নিয়ে ... বিতর্ক চলেছে। বিতর্কটার প্রধান জায়গা হচ্ছে কৃষক আর্থব্যবস্থা আসলেই স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা কিনা। অনেকেই মনে করেছেন কৃষকদের মধ্যে একেবারেই বিশিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাঁদের আর্থনীতিক কর্মকান্ড এবং চর্চা অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে একেবারেই আলাদা। আবার অন্য দল শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন কৃষক আর্থব্যবস্থাকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা বলা যায় না।

নৃবিজ্ঞানে দীর্ঘকাল ধরে কৃষক আর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চলেছে। আসলে বলা উচিৎ বিতর্ক চলেছে। বিতর্কটার প্রধান জায়গা হচ্ছে কৃষক আর্থব্যবস্থা আসলেই স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা কিনা। অনেকেই মনে করেছেন কৃষকদের মধ্যে একেবারেই বিশিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাঁদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং চর্চা অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে একেবারেই আলাদা। ফলে তাঁদের আর্থনীতিক কর্মকান্ডকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা বলা প্রয়োজন। আবার অন্য দল শক্তিশালী যুক্তি দেখিয়েছেন কৃষক আর্থব্যবস্থাকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা বলা যায় না। বিশেষভাবে বর্তমান কালে সারা পৃথিবীর কৃষক বর্গএকটা সাধারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এমন নয় যে তাঁদের মধ্যে অবস্থার কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু একটা অভিন্ন বাস্তবতা হচ্ছে পুঁজিবাদ। বর্তমান পৃথিবীর সকল অঞ্চলের কৃষকরাই কোন না কোন ভাবে এই ব্যবস্থার অন্তর্গত। ফলে আর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী বা বাজার আর্থব্যবস্থা বলা প্রয়োজন।

এই বিতর্কটির একটি প্রেক্ষাপট আছে। আপনারা আগেই দেখেছেন: নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই প্রযুক্তি এবং পরিবেশের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কখনো কখনো এর নাম খাদ্য সংগ্রহ কৌশল। এখানে নৃবিজ্ঞানীদের একটা ধারণা কাজ করেছে, তা হচ্ছে কোন একটা ব্যবস্থা অন্য ব্যবস্থার চেয়ে প্রাচীন এবং প্রযুক্তির দিক থেকে নিকৃষ্ট। মোটামুটি ব্যাপারটা এরকম:

শিকারী-সংগ্রহকারী --> পশুপালন --> উদ্যানকৃষি --> নিবিড় কৃষি --> শিল্প

দেখা গেছে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা পৃথিবীতে একটা লম্বা সময় ধরে প্রচলিত আছে। বর্তমান শিল্প ভিত্তিক উৎপাদনের যুগেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ প্রথমত, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটা অন্যতম উৎস কৃষি। দ্বিতীয়ত, মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস এখনও কৃষি। ফলে তৃতীয় গুরুত্ব নতুন করে নৃবিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে।

আরেকটি প্রেক্ষাপট রয়েছে এই বিতর্কের। এই শতকে, বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে কৃষক বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এই সময়কালে তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে কৃষিক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য প্রাথমিকভাবে নৃবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের বিস্মিত করেছে। এই বিষয়টাকে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে এবং বাজারের মুনাফার আশায় শিল্পোন্নত দেশগুলোতে কৃষির বিশাল বিশাল খামার গড়ে উঠেছে। অবশ্য এই প্রবণতাটি আরও আগে থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিল্পভিত্তিক সমাজে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বহু সমাজে কৃষিক্ষেত্র তখনও ক্ষুদ্রাকার আছে। অনেক চাষীই কোন রকমে নিজেদের জমিতে বছরের খোরাকী উৎপাদনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বুঝবার জন্য অনেক নৃবিজ্ঞানী একে ঐ বিশেষ সমাজের প্রথা কিংবা রীতি-নীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে বিষয়টা এত সহজ-সরল নয়। যাই হোক, তৃতীয় বিশ্বের সমাজগুলোতে চলমান অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে কৃষকদের এই বৈশিষ্ট্যকে অনেকেরই বেমানান মনে হয়েছে। ফলে কৃষকদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে একটা স্বতন্ত্র আর্থব্যবস্থা ভাববার এটাও একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে । যাঁরা মনে করেন কৃষক আর্থব্যবস্থা স্বতন্ত্র তাঁরা অনেকেই আর্থব্যবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। সেগুলি হচ্ছে: আদিম বা "উপজাতীয়" আর্থব্যবস্থা (primitive/tribal economy), কৃষক আর্থব্যবস্থা (peasant economy) এবং আধুনিক বা শিল্প আর্থব্যবস্থা (modern/industrial economy)। কৃষক আর্থব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়নের সুস্পষ্ট নজির থাকলেও নৃবিজ্ঞানের শুরুর দিকে কৃষকদের একটা মধ্যকালীন দশা হিসেবে দেখা হ'ত।

পরবর্তী কালে এই চিন্তা আর সমর্থন লাভ করেনি। অনেক তাত্ত্বিক কৃষক বলতে কেবলই ভূমি নির্ভর কৃষিকাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অন্যেরা আবার মনে করেছেন মৎস্যজীবী কিংবা গ্রামীণ কারিগরদেরও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে দেখা প্রয়োজন। একটা ব্যাপারে অনেকেই একমত যে, কৃষক সমাজ আর শহুরে সমাজের মধ্যে একটা ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। কৃষক সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই ধারণাকে কেন্দ্র করে অনেকেই এগিয়েছেন।

কৃষক আর্থব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়নের সুস্পষ্ট নজির থাকলেও নৃবিজ্ঞানের শুরুর দিকে কৃষকদের একটা মধ্যকালীন দশা হিসেবে দেখা হ'ত। পরবর্তী কালে এই চিন্তা আর সমর্থন লাভ করেনি।

ফার্মার (farmer) এবং পেজেন্ট (peasant)

বর্তমান পৃথিবীর কৃষকদের মধ্যকার ভিন্নতাকে বোঝানোর জন্য দুটো ধারণা বা প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় – ফার্মার এবং পেজেন্ট। চলতি বাংলায় আমরা দুটোকেই কৃষক বলে থাকি। তবে ফার্মারদের বৈশিষ্ট্য চিন্তা করলে বলা যায় বাংলাদেশে কোন ফার্মার নেই। ফার্মারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আগেই বলা হয়েছে, এদের বিশাল পরিমাণ জমি আছে। এক জোতে জমির পরিমান কয়েক 'শ একর থেকে শুরু করে হাজারের উপর একর হতে পারে। তাছাড়া জমি চাষের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। কৃষিক্ষেত্রে যা উৎপাদন করেন তাঁর পুরোটাই বাজারের জন্য। এর মানে কৃষিক্ষেত্র হতে নিজেদের খোরাকীর জন্য কিছু উৎপাদন করতে হয় না। এতবড় কৃষিক্ষেত্র তার জন্য প্রয়োজনীয়ও নয়। বরং তাঁরা উৎপাদন করেন বাজার থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য। সেই দিক থেকে ফার্মারকে আমরা **কৃষি-খামার মালিক** বলতে পারি। পক্ষান্তরে, পেজেন্ট বলতে বোঝানো হয়েছে মূলত যাঁরা ছোট জোতের মালিক। নৃবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে পেজেন্ট বা কৃষকরা অনেক ক্ষেত্রেই বাজারে মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন করে থাকেন না। তাঁরা উৎপাদন করে থাকেন জীবন ধারণের জন্য। অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যে সকল খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন প্রয়োজন – এই কৃষকেরা সেগুলোই উৎপাদন করেন। এই সব যুক্তি থেকেই একটা ধারণা চালু রয়েছে। তা হচ্ছে **স্বপোষী আর্থব্যবস্থা** (subsistence economy)। কৃষক আর্থব্যবস্থা বলতে আলাদা করে যে ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে তা আসলে এটা। যে সমস্ত নৃবিজ্ঞানী এই বিষয়ে কাজ করেছেন তাঁদের অনেকেই মনে করেন কৃষক আর্থব্যবস্থা সহজে পরিবর্তনীয় নয়।

*কৃষকদের একটা অংশ বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন করেন – এই যুক্তি থেকেই একটা ধারণা চালু রয়েছে। তা হচ্ছে **স্বপোষী আর্থব্যবস্থা**। কৃষক আর্থব্যবস্থা বলতে আলাদা করে যে ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে তা আসলে এটা।*

এখানে একটা ব্যাপার আলাদা করে খেয়াল রাখা দরকার আছে। নৃবিজ্ঞানীরা যে সকল সমাজে কৃষক আর্থব্যবস্থা বলতে স্বপোষী ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছেন সেই সমাজগুলি ইউরোপের বাইরে ছিল। পক্ষান্তরে কৃষি খামারের অস্তিত্ব দেখা গেছে ইউরোপে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ উত্তর আমেরিকায়। নৃবিজ্ঞানীদের এই পর্যবেক্ষণের সময়কালকে তাই বিবেচনায় রাখা দরকার। পৃথিবী ব্যাপী বাজার ব্যবস্থার বিস্তার কি ধরনের পরিবর্তন এনেছে তা নিয়ে ভাবতে হবে। বাজার ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মুনাফা অর্জনের ব্যাপারটা কেবল একটা স্থানীয় পর্যায়ে সীমিত থাকে না। এটা সারা দুনিয়া জুড়ে একটা ব্যবস্থা। ফলে সেভাবে দেখতে হবে এই বিষয়টাকে। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার আগে কৃষক আর্থধরন (peasant ecotypes) নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা যাক।

কৃষক আর্থধরন

নৃবিজ্ঞানী এরিক উল্‌ফ কৃষক আর্থব্যবস্থার ধরন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরিক উলফের একটা গুরুত্ব হচ্ছে তিনি অনেকের মত কৃষকদের অপরিবর্তনীয় মনে করেননি। তাছাড়া, তাঁর মতে কৃষকদের দেখতে হবে বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে। কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করে নৃবিজ্ঞানের পাঠ কার্যকরী নয় বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

কৃষক আর্থধরন বা পেজেন্ট ইকোটাইপ ভাগ করতে গিয়ে এরিক উলফ প্রথমত দুইটি ভাগ করেছেন: প্যালিওটেকনিক ইকোটাইপ (paleotechnic ecotype) এবং নিওটেকনিক ইকোটাইপ (neotechnic ecotype)। এই দুটো ভাগের ভিত্তি হচ্ছে শ্রম ও প্রযুক্তি। প্রথমটিতে মানুষ ও গবাদিপশুর শ্রম গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়টিতে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে নানান ধরনের জ্বালানী শক্তি এবং কৌশল ব্যবহৃত হয়। প্যালিওটেকনিক ইকোটাইপের মধ্যে প্রধান পাঁচটি ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে: দীর্ঘকাল ধরে জমি অনাবাদী রাখার পদ্ধতি বা সুইডেন (swidden) পদ্ধতি, জমি ভেদে অনাবাদী রাখার পদ্ধতি, স্বল্পকালীন জমি অনাবাদী রাখার পদ্ধতি, পাকাপোক্ত চাষবাদ বা সেচ পদ্ধতি (hydraulic system) এবং বাছাইকৃত জমিতে পাকাপোক্ত চাষাবাদ। এর মধ্যে সুইডেন, স্বল্পকালীন এবং সেচ পদ্ধতিকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে। নিওটেকনিক ইকোটাইপে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন উল্লেখ করা হয়েছে: বিশিষ্ট উদ্যানকৃষি, পশু খামার, মিশ্র চাষবাস যেখানে একই সঙ্গে পশু এবং শস্য বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয়, গ্রীষ্ম অঞ্চলের বিশেষ কিছু শস্য উৎপাদন যেমন কফি বা আখ ইত্যাদি। এরিক উলফ নানান সমাজের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তাঁর এই আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখানে ইকোটাইপ বা আর্থধরন দুটোর মধ্যকার পার্থক্যের ভিত্তি

এরিক উলফের একটা গুরুত্ব হচ্ছে তিনি অনেকের মত কৃষকদের অপরিবর্তনীয় মনে করেননি। তাছাড়া, তাঁর মতে কৃষকদের দেখতে হবে বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে।

শ্রম এবং প্রযুক্তি হলেও এখানে বাজারের একটা ভূমিকা আছে। দ্বিতীয় ইকোটাইপের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাজারের জন্য উৎপাদন। এখানে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকেও আলোচনা করা হয়েছে। আঠারো শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে দ্বিতীয় ইকোটাইপের বিস্তার দেখা দেয়, এবং মূলত ইউরোপে। শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে একই সময়কালে এই ধরনের ইকোটাইপ বিস্তৃত হয়। তাই এ সংক্রান্ত আলোচনায় পৃথিবীর সমগ্র কৃষিব্যবস্থার পরিস্থিতিকে একত্রে বিবেচনা করা সুবিধাজনক। কৃষিব্যবস্থা নিয়ে কাজে এরিক উলফ দেখান যে, কৃষকরা যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করেন তা শাসকগোষ্ঠীর কাছে চলে যায়। শাসকগোষ্ঠী নিজের প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করে এবং একই সঙ্গে অপরাপর কৃষি বহির্ভূত সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিলি বণ্টনও করে।

শিল্প এবং কৃষি : কাঁচামালের সম্পর্ক

শিল্প-কল-কারখানাতে খনিজ সম্পদ এবং কৃষিজ উৎপাদন কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে খনিজ দ্রব্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে, খনিজ দ্রব্য বা কৃষিজ কাঁচামাল উভয়ই সরবরাহ হয়েছে গরিব দেশগুলো থেকে যেখানে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল না।

আগেই বলেছি বাজার একটা জায়গায় সীমিত নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিকাজের ভিন্নতা বুঝতে গেলে সারা পৃথিবীর বাজার ব্যবস্থাকে চিন্তা করতে হবে। কিছু নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীর মতে শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পের বৈশিষ্ট্য না আলোচনা করে কৃষক বা কৃষি নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আপনারা জানেন যে শিল্প বিপ্লব হয়েছে ইউরোপে। আপনারা এও জানেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্প-কল-কারখানা স্থাপিত হয়েছে ইউরোপে এবং আমেরিকা মহাদেশে। কিন্তু শিল্পের জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন পড়ে। সাধারণভাবে শিল্প-কল-কারখানাতে খনিজ সম্পদ এবং কৃষিজ উৎপাদন কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে খনিজ দ্রব্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু প্রাথমিকভাবে, খনিজ দ্রব্য বা কৃষিজ কাঁচামাল উভয়ই সরবরাহ হয়েছে গরিব দেশগুলো থেকে যেখানে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল না। আজ আমরা নিউজিল্যান্ড কিংবা ডেনমার্কে গরুর খামারের কথা শুনে, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমের বিপুল উৎপাদনের কথা জেনে মনে করতে পারি সেইসব দেশ বোধহয় কাঁচামালের জন্য কারো উপর নির্ভর করে না। কিন্তু আসলে একেবারেই উল্টো। শিল্পের শুরুর সময়ে আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সমাজগুলো থেই কাঁচামাল গেছে শিল্পভিত্তিক দেশে।

*অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করানো হ'ত জোর-জবরদস্তি করে। আবার জোর-জবরদস্তি করেই কোন একটা কিছুর চাষ বা উৎপাদন বন্ধ করেও দেয়া হ'ত। বাংলা অঞ্চলে **নীল চাষের** কথা আপনারা জানেন।*

ইউরোপের দেশগুলো বিভিন্ন প্রান্তের সমাজ দখল করে নিয়েছিল বলে কাঁচামাল সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে তাদের পক্ষে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: ইউরোপে যখন বস্ত্র শিল্পের প্রসার ঘটায় তখন তার জন্য প্রয়োজনীয় তুলা সরবরাহ হ'ত ইউরোপের বাইরে থেকে। একই কথা তামাক কিংবা চিনি এবং আরও শিল্প নিয়ে বলা চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করানো হ'ত জোর-জবরদস্তি করে। আবার জোর-জবরদস্তি করেই কোন একটা কিছুর চাষ বা উৎপাদন বন্ধ করেও দেয়া হ'ত। বাংলা অঞ্চলে **নীল চাষের** কথা আপনারা জানেন। নীল চাষ করবার জন্য এখানকার চাষীদের উপর বল প্রয়োগ করা হ'ত। চাষীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন – সে কথাও আপনাদের জানা। তেমনি এখানকার বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করবার জন্য মসলিন কারিগরদের উপর নির্যাতনের কথাও জানা যায়। এই সকল ইতিহাস লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, কৃষকরা নিজের ইচ্ছেতে নগদ বিক্রির ফসল (cash crop) উৎপাদন করেন – এই ধারণাটি সঠিক নয়। চাপের মধ্য দিয়ে কৃষকরা এই ধরনের ফসল উৎপাদন করেছেন।

তাছাড়া পুঁজিবাদী সমাজে নানা কারণে নগদ মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেক্ষেত্রেও কৃষক নগদ বিক্রির ফসল উৎপাদন করতে পারেন। এর মানে এই নয় যে, কৃষক-কিষাণীরা তাঁদের গেরস্তালির জন্য প্রয়োজনীয় খোরাকী উৎপাদন করবার পর এই ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। বরং, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেদের জমি থেকে সংসারের খোরাকী যোগাড় করতে পারেন না। অর্থাৎ, কৃষিক্ষেত্রে একটা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কৃষকদের উৎপাদনে বদল এসেছে। এখনও ইউরোপ-আমেরিকার বিশাল সব শিল্প দাঁড়িয়ে আছে গরিব বিশ্ব থেকে সরবরাহ করা কৃষিজ কাঁচামালের উপর। এই সব শিল্পের মধ্যে রয়েছে ওষুধ, চা, কফি, কোকো, তামাক, বস্ত্র, রাবার, কাগজ, চামড়া, সামুদ্রিক খাবার ইত্যাদি। কাঁচামালের জন্য ঐ সকল দেশ খুব সামান্য আয় করে। পক্ষান্তরে, শিল্পজাত দ্রব্যের দাম চড়া হওয়ায় শিল্পভিত্তিক দেশগুলো দুইবার লাভ করে। অনেক গবেষকের মতে, এটা দরিদ্র দেশগুলো দরিদ্র থেকে যাবার একটা কারণ। উপনিবেশের সময়কাল থেকেই এই বৈষম্য চলে আসছে। কৃষক আর্থব্যবস্থা বুঝবার জন্য এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখা দরকার। শিল্পের জন্য কাঁচামাল ছাড়াও স্বচ্ছল শ্রেণীর ভোগের প্রয়োজনে কৃষকেরা ফসল উৎপাদন করে থাকেন। যেমন, বর্তমান বাংলাদেশে শীতকালীন সব্জী, গ্রীষ্মকালের আম ইত্যাদি মূলত শহুরে স্বচ্ছল মানুষের জন্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশে কৃষকদের অর্থনৈতিক দশা

একদিকে, কৃষক নগদ বিক্রির জন্য ফসল উৎপাদন করছেন। সারা পৃথিবীতে এই পরিবর্তন কৃষকদের কোন স্বনির্ভর ব্যবস্থা চালু রাখেনি। অন্যদিকে, বিশেষভাবে বাংলাদেশের কৃষকেরা উৎপাদনের বিনিময়ে খুব সামান্য জিনিস যোগাড় করতে পারেন। তা দিয়ে কোনমতেই জীবন নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের কৃষকদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার প্রশ্ন। যে প্রক্রিয়ায় কোন সামাজিক গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে সহায়-সম্পদহীন হয়ে পড়ে তাকে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া বলে। বাংলাদেশের কৃষকেরা খুব দ্রুত নিঃস্ব শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ছেন।

বাংলাদেশের কৃষকদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার প্রশ্ন।

কৃষকদের নিয়ে যে সকল গবেষক কাজ করেছেন তাঁরা আর্থিক অবস্থা ও সম্পদ বিবেচনা করে কৃষকদের মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে: ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক, গরিব বা ক্ষুদ্র কৃষক এবং নিঃস্ব কৃষক। বুঝবার সুবিধার জন্য খোরাকী ধরে এগোনো যেতে পারে। ধনী কৃষকদের জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল বা আয় আসে তা সারা বছরের প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত। মধ্য কৃষকদেরও সারা বছরের খোরাকী জমি থেকেই আসে। কেবল তাই নয় ধনী কৃষকদের আয়ের উৎস কেবলমাত্র জমি নয়। এদের অনেকেরই নানারকম ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা লগ্নী করা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সেসব ব্যবসা কৃষি সংক্রান্ত। যেমন, সার, কিটনাশক কিংবা সেচের ব্যবসা। আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্য নানান ধরনের ব্যবসা। এর মধ্যে সুদে টাকা খাটানোর কাজও আছে। ফলে এই বর্গের কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বা অন্য কোন বিপর্যয়ের শিকার হতে হয় না। ধনী কৃষক কিংবা মধ্য কৃষকেরা জমিতে সরাসরি শ্রম দেন না। বরং তাঁরা জমি বর্গা কিংবা বন্ধক দেন অন্যান্য কৃষকদের। সাধারণভাবে গরিব কৃষকেরা, কখনো কখনো মধ্য কৃষকেরা এইসব জমি বর্গা বা বন্ধক নিয়ে থাকেন। গরিব কৃষকেরা জমিতে নিজেদের শ্রম সরাসরি প্রয়োগ করে থাকেন। আর নিঃস্ব কৃষকদের এমন কোন পুঁজি হাতে থাকে না যা দিয়ে তাঁরা জমি বর্গা নিতে পারেন। তাঁরা আসলে কৃষিক্ষেত্রে কামলা খাটেন। বাংলাদেশের সরকারী নথিতে এবং অন্যান্য সাহিত্যে এঁদেরকে ভূমিহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে সিংহভাগ এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের সংখ্যা নিয়ে সরকারী নথি এবং গবেষকদের হিসেবের মধ্যে বিরাট গরমিল আছে। কিন্তু এটা প্রায় পানির মত পরিষ্কার যে দিন দিন এই ধরনের কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে।

এঁদের সংখ্যা নিয়ে সরকারী নথি এবং গবেষকদের হিসেবের মধ্যে বিরাট গরমিল আছে। কিন্তু এটা প্রায় পানির মত পরিষ্কার যে দিন দিন এই ধরনের কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে।

জমির কাজে শ্রম দেবার বিষয়টা ভাবলে কৃষকের সংজ্ঞা নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ তৈরি হয়। জমির মালিক হলেই কি তাঁকে কৃষক বা চাষী বলা যাবে? বাংলাদেশের গ্রামে একটা কথা চালু আছে: 'চাষা যে চাষ করে।' সেই হিসেবে গরিব এবং নিঃস্ব বা ভূমিহীন কৃষকেরাই হচ্ছেন চাষী। দিন দিন এই বর্গের কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে এট বোঝা যায় যে কৃষিক্ষেত্রে যে সকল নীতিমালা চালু আছে তা কৃষকের স্বার্থের বিপক্ষে। বাংলাদেশের গ্রামে কামলা খাটার কাজও এখন অনেক সীমিত। ফলে গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের বিশাল দল প্রতিবছর শহরে পাড়ি জমায়। এইসব নিঃস্ব কৃষকেরা শহরে নানারকম পেশায় নিয়োজিত থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে চলেছেন। যেমন, রিক্শা চালানো, ছোট পান বিড়ির দোকান চালানো, কাগজ কুড়ানো, নানাবিধ খুচরা কামলা খাটার কাজ, ইদানিং কালে নির্মাণ শ্রমিক ইত্যাদি। শহরে এইসব পেশা খুবই অনিশ্চিত। কিন্তু নিরুপায় ভূমিহীনদের আর কোন অবলম্বন নেই। বাংলাদেশের সরকারসমূহ সব সময় আশ্বাস দিয়ে এসেছে যে সরকারী খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে দেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ কখনোই নেয়া হয়নি। উপরন্তু এজমালি যে জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীদের একটা ভরসার জায়গা ছিল, বাংলাদেশে গত কয় বছরে সেগুলোও লীজ দেয়া হচ্ছে। ভূমিহীন কৃষকেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় রুখে দাঁড়িয়েছেন। পরবর্তী ইউনিটে (দেখুন ৭ নম্বর ইউনিটের ৪ নম্বর পাঠ) এ নিয়ে আলোকপাত করা হবে। যে সকল ভূমিহীন গ্রামে আছেন তাঁদের মধ্যে এনজিও নানা ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছে। এসব তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিঃস্ব কৃষকদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে একটা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গড়ে তোলা। প্রধানত কুটির শিল্প ভিত্তিক কাজ এতে হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা ইত্যাদি এনজিও'র কথা বলা যায়। দেশী এ সকল এনজিও'র পাশাপাশি বিদেশী অনেক এনজিও এই একই কাজ চালাচ্ছে।

সারাংশ

নৃবিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে কৃষক আর্থব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞানের চর্চাকারীদের অনেকেই মনে করেন কৃষকদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্বতন্ত্র। কিন্তু অন্যান্য নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন, অপরাপর প্রক্রিয়া থেকে কেবলমাত্র কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে, বর্তমান পুঁজিবাদী বিশ্বে কৃষকদের অস্তিত্ব অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত – যেমন, রাষ্ট্র। সামাজিক ইতিহাসে যাঁদের উৎসাহ আছে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন যে, ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিল্প শক্তিশালী হবার পেছনে গরিব বিশ্বের কৃষির বিরাট ভূমিকা। সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে কৃষি বিষয়ক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বোঝা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষজন মূলত ভূমিহীন এবং মজুর শ্রেণীর। নিঃস্ব হবার কারণে এর বড় অংশই খুচরা শ্রমিকের কাজ পাবার আশায় শহরে পাড়ি দিচ্ছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন -

১। কৃষক আর্থধরন বা পেজেন্ট ইকোটাইপ -কে নৃবিজ্ঞানী এরিক উলফ প্রথমতঃ কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?

ক. ২টি　　খ. ৩টি
গ. ৪টি　　ঘ. ৫টি

২। সুইডেন (swidden) পদ্ধতি কী?

ক. জমি অনাবাদী রাখার পদ্ধতি　　খ. জমি ভেদে অনাবাদী রাখার পদ্ধতি
গ. স্বল্পকালীন জমি অনাবাদী রাখার পদ্ধতি　　ঘ. পাকাপোক্ত চাষাবাদ

৩। আঠারো শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মধ্যে দ্বিতীয় ইকোটাইপের বিস্তার দেখা দেয় মূলতঃ ----------?

ক. এশিয়ায়　　খ. আমেরিকায়
গ. ইউরোপে　　ঘ. আফ্রিকায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কৃষক আর্থব্যবস্থা বলতে স্বতন্ত্র কিছু বোঝায় কী?
২। বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। 'বর্তমান কালে কৃষকরা কৃষি মজুরে পরিণত হয়েছে'। আপনি কি তাই মনে করেন?
২। কৃষকদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিল্পোন্নত সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।